বাংলার বনদেবতা

সম্পাদনা ঃ তুলিকা মজুমদার

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা ৭০০০০৯

Bangler Banadevata (A collect'on of essays on Forest
Deities of Bengal) : Edited by Tulika Majumdar

প্রথম প্রকাশ : ৪ ডিসেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক ঃ রেখা রাউত
আকাদেমি অব ফোকলোর
২০এ, সেন্ট্রাল রোড
কলকাতা ৭০০০৩২

প্রচ্ছদ ঃ অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর ঃ অনিল কুণ্ডু
গীতা প্রিন্টার্স
২১ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রাক্‌কথা

বাংলাদেশ ঃ ভূ-প্রকৃতি ও জনবিন্যাস

বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এই দেশের ভৌগোলিক ও জনবিন্যাসের অন্তরঙ্গ প্রকৃতি জানা দরকার। শুধুমাত্র এক খন্ড ভূমি নিয়েই দেশের সীমা ও পরিচয় নির্ধারণ করা যায় না। সামগ্রিকভাবে দেশের জনসাধারণের আচার-আচরণ, ধর্ম-কর্ম, পূজা-পার্বণ, দেব-দেউল ইত্যাদির 'অলিখিত ইতিহাস' জানা দরকার। তবেই দেশকে প্রকৃত জানা যাবে।

এখানে বাংলাদেশ অর্থে অখন্ড বাংলাকেই গ্রহণ করেছি। যদিও রাষ্ট্রনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ আজ দ্বিখণ্ডিত। কিন্তু একথা সত্য যে রাজনীতি কোন অঞ্চলের অখন্ড সাংস্কৃতিক সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারে না। সংস্কৃতি অবিভাজ্য। একই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি রাজনৈতিক বিপর্যয়ে খণ্ডিত হয় না, হতে পারে না। কেননা দেহের কোন প্রত্যঙ্গ দুর্ঘটনায় হারিয়ে ফেলতে পারি, কিন্তু প্রাণ বা আত্মা—কখনও খণ্ডিত করা চলে না। এই প্রাণের যোগে, আত্মার অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাংলাদেশ অবিভাজ্য ও এক। বাংলার সংস্কৃতিও সেইদিক থেকে অখন্ড।

দেশ, কাল ও পাত্রের সম্মিলিত ও সমন্বিত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়ে

অঞ্চল বিশেষের চিৎ-প্রকর্ষ ও মনন-ক্রিয়া ধরা পড়ে। কোন দেশের প্রাকৃতিক সীমা দিয়ে, সেই দেশের সাংস্কৃতিক সীমা নির্ধারণ করা চলে না। কারণ সাংস্কৃতিক সীমা রাষ্ট্রসীমাকে অতিক্রম করে, অভিভূত করে, অধিকার করে। যেমন নদীর উচ্ছল তরঙ্গরাশি তটরেখাকে অতিক্রম করে, ঠিক তেমনি সংস্কৃতি-সীমা মানসিক ভাব-তরঙ্গে দেশের সীমা অতিক্রম করে।

আধুনিক বাংলাদেশের উত্তর সীমায় রয়েছে মহামৌনী হিমালয় ও সিকিম, ভুটান, তিব্বত। দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি কোচবিহার-কামরূপের সীমা চুম্বন করেছে। এখানকার অধিবাসীরা পার্বত্য অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন ভূমির আদিবাসী। বিশেষত কোচ; রাজবংশী, হাজং, টোটো, ভোটিয়া শ্রেণীর। এরা মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর শাখা-প্রশাখা। এখানেই অধিকাংশ পাহাড়ী নদীর জন্ম। যেমন ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া, মহানন্দা, তিস্তা, তোর্সা ইত্যাদি। পূর্ব-প্রান্তে ব্রহ্মদেশ, গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, লুসাই ও আরাকান শৈলশ্রেণী। ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী, শংখ ইত্যাদি এখানকার নদীগুলি খুব দুরন্ত। এই পূর্বসীমায় রয়েছে বর্তমান বাংলাদেশ (পূর্ব বাংলা)। পশ্চিম সীমায় মালদহ-দিনাজপুরের সীমানা ছুঁয়ে রয়েছে বিহার। আরো নীচের দিকে মানভূম এবং মেদিনীপুরের সীমালগ্ন হয়ে আছে উড়িষ্যা বা উৎকল। দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগর ও তার তটভূমি। এই তটরেখাকে বেষ্টন করে 'মেদিনীপুর-চব্বিশ পরগনা-খুলনা-বরিশাল-ফরিদপুর-ঢাকা ও ত্রিপুরার দক্ষিণতম প্রান্ত (অর্থাৎ চাঁদপুর) নোয়াখালি-চট্টগ্রামের সমতটভূমির সবুজ বনময় অথবা বৃক্ষ শস্যশ্যামল আস্তরণ'। এই অঞ্চল নদী-নালা·খাল-বিল-বনে সমাচ্ছন্ন। সবুজের অপূর্ব সমারোহ মন ভোলায়। বনভূমি ও নদী-সমুদ্রের সঙ্গমতীর্থ এই সমতট অঞ্চল। কবি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র অতি সুন্দরভাবেই কবিতায় বঙ্গের সীমা নির্দেশ করেছেন—

আমাদের সীমা হ'লো
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে টেরাই।

উত্তর ও দক্ষিণের এই বনভূমি বাংলাদেশের কৃষ্টি বা সংস্কৃতিকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ধর্ম-কর্ম, আচার-আচরণকে প্রভাবিত করেছে। ভূ-প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের জন্যই বাংলার সংস্কৃতিও বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়েছে। "এই প্রাকৃতিক

সীমাবিধৃত ভূমিখন্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়-পুন্ড্র-বরেন্দ্রী-রাঢ়-সুহ্ম-তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল প্রভৃতি জনপদ ; ভাগীরথী-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদ-নদী বিধৌত বাংলার গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার। এই ভূখন্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর কর্ম-কৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি।"[১] বন্য-হিংস্র শ্বাপদসংকুল বাংলাদেশের জীবনপ্রবাহ প্রকৃতির দ্বারা সুনিপুণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

আজকের বাংলাদেশ আর প্রাচীন 'বঙ্গ' এক নয়। কারণ তখন 'বঙ্গ' ছিল বাংলার বহু জনপদের মধ্যে অন্যতম। "সমগ্র দেশ বোঝাতে 'বাঙ্গালা' এই নাম মোগলদের অধিকারকালেই প্রথম ব্যবহৃত হয়। তার আগে সমগ্র বাংলাদেশ বোঝাতে 'গৌরবঙ্গ' বা 'গৌড় বাঙ্গালা' শব্দ ব্যবহার করা হত। বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি 'বঙ্গপাল' থেকে বলে মনে হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে সেকালে প্রধানত জলা জায়গা ছিল। এই জলা জায়গার সাধারণ নাম ছিল বঙ্গ। আর বঙ্গের অধিবাসীরা বঙ্গাল নামে খ্যাত ছিল অন্তত পক্ষে একাদশ শতাব্দী থেকে। প্রাচীন কালে আধুনিক বাংলাদেশ প্রধানত চার বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল—বরেন্দ্রী, সুহ্ম (বা রাঢ়া), বঙ্গ ও কামরূপ। গৌড় বলতে সাধারণত রাঢ়-বরেন্দ্রী অর্থাৎ উত্তর ও পশ্চিম বাংলা আর বঙ্গ শব্দে বঙ্গ-কামরূপ অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব বাংলা বোঝাত।"[২] ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন—"বঙ্গ" শব্দের সঙ্গে আল্ (সংস্কৃত আলি, পূর্ববঙ্গীয় আইল) যুক্ত হইয়া বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাই আবুল ফজলের ব্যাখ্যা।[৩]

প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ যে সব জনপদে বিভক্ত ছিল বঙ্গ ও বঙ্গাল তার দুটি বিভাগ মাত্র। মধ্যযুগে এই দুই বিভাগ সমন্বিত হয়ে 'বাংলা' এই নামে সৃষ্টি হয়। এই জনপদের নাম 'বাংলা' হওয়ার পেছনে নৃতাত্ত্বিক কিছু কারণ আছে বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। 'বঙ্গ' বা 'বঙ্গাঃ'[৪] এই নামের কোন আদিম নরগোষ্ঠী সম্ভবত এই ভূখন্ডে বসবাস করত। চর্যাপদের "আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভৈলি, নিঅ ঘরনী চন্ডালী লেলি" পদে 'বঙ্গালী' নরগোষ্ঠী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। জন বা কোমের নামকে কেন্দ্র করে প্রাচীন কালে অনেক ভূখন্ডের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন সাঁওতাল পরগনা, ডোমজুড় ইত্যাদি।

একদা আর্যজন কর্তৃক অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য এই বঙ্গদেশের লোক 'অন্যব্রত' বা 'ব্রাত্য' বলে খ্যাত হত। বোধায়নের ধর্মসূত্র থেকে জানা যায় বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসীরা ছিল দীর্ঘ মস্তকবিশিষ্ট, অনাসা, কৃষ্ণবর্ণের। নৃতত্ত্ববিদেরা এদের বলেছেন প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড্, দ্রাবিড়ীয়, আল্পাইন্। এদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ইত্যাদি। পঞ্জাব থেকে তাইল্যান্ড পর্যন্ত এই ভাষাগোষ্ঠীর লোক সম্প্রসারিত। এই ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে সর্বশেষে সমন্বয় ঘটলো আর্যভাষা গোষ্ঠীর লোকদের। আর্যেতর ভাষার মধ্যে অস্ট্রিক ভাষা বাংলাভাষাকে বিশেষ প্রভাবিত করেছে। বাংলার গ্রামনামগুলো আর্যেতর ভাষার সার্থক পরিচয়বহ। যেমন ঃ বাঁকুড়া, হাওড়া, শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ি, নয়নজুলি, ডোমজুড়, আসান্সোল, হোটর, বেদেডাঙ্গা, সামসী, কাঁটাডি ইত্যাদি অসংখ্য গ্রামনাম উদ্ধৃত করা চলে। বাংলার আদিমতম অধিবাসী এই যে অনার্যজন, এরা সকলেই কিন্তু চাষী ছিল না। ভূ-প্রকৃতির বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের জন্য এরা কর্ম ও জীবিকার দিক থেকে ছিল বিভিন্ন। এদের মধ্যে অনেকে ছিল নিষাদ, কিরাত, যাযাবর। ধনু, ধনুক, পিনাক, বাণ, লাঙ্গুল (লাঙ্গল) ইত্যাদি শব্দ আর্যেতর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার প্রতি যথার্থ ইঙ্গিত করে। লোকায়ত বঙ্গসংস্কৃতির ধারা বিপুল এবং সুবিস্তৃত। এই লোকায়ত উপকরণই বাংলাদেশের সংস্কৃতির মৌলিক উপকরণ। বাংলার ধম-কর্ম, পূজাপার্বণের সবটাই লোকায়ত। সংস্কৃতির গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানী ডঃ বিনয় সরকার বলেছেন ঃ "ডোম, হাড়ি, চামার, বাগদী প্রভৃতি তথাকথিত "ছোটজাত" (বাংলাদেশের) ...দেবদেবী বানানোর কাজে সাহায্য করিয়াছে। এই ব্যাপারে অনার্য এবং তথাকথিত ছোট জাতগুলোর সৃষ্টিশক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"[৫]

বাংলাদেশের লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে শীতলা, চন্ডী, কালী, বেহুলা, রাধা এবং উৎসবের মধ্যে গাজন, গম্ভীরা, চড়ক, হোলি ইত্যাদি আর্যের অনার্যীকরণের যথার্থ নিদর্শন। সুতরাং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হলে, সমাজের নিম্নভূমিতে যে জনগোষ্ঠী বাস করছে তাদের আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব, পাল-পার্বণ, গান-গীতিকা ইত্যাদি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। তবেই দেশ এবং দেশজ সংস্কৃতির যথার্থ রূপ উদ্ঘাটিত হবে। জাতির মানস ও মননের ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাস। ইতিহাসের রাজপথে জনমানসের পরিচয় মেলে না। জনমানসের স্বরূপ নিহিত থাকে ইতিহাসের

গলিপথে। বাঙালীর মানস ইতিহাসও মানস জগতের অন্তস্থলে নিহিত। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মানুষের সামাজিক জীবন প্রসংগে বলেন: "মানুষ সামাজিক জীব: সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করবার প্রেরণায় ও প্রয়োজনে নানা কর্মসূত্রকে আশ্রয় করে এক একটি সমাজ সে গড়ে তোলে, নিজেরই পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য। ধর্মকর্ম, শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতি যেমন এই কর্মসূত্রের অন্তর্গত, রাষ্ট্রবন্ধন, বর্ণবন্ধন, গোষ্ঠীবন্ধন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শস্যোৎপাদন, রন্ধনক্রিয়া, অশনবসন, প্রজনন, আচার-ব্যবহার, ছোটবড় তুচ্ছ যত কর্ম, সমস্তই বিশেষ দেশ ও কালের সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন সূত্র বা অংগ, যারা আবার একে, অন্যে পারস্পরিক সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে সমাজদেহকে ধারণ করে রাখে।"৬ সমাজের এই বিভিন্ন দিকের পরিচয়ই খাঁটি দেশ পরিচয়। শুধু বহিরঙ্গের পর্যবেক্ষণ বা আলোচনায় জাতির যথার্থ স্বরূপ লাভ করা যায় না। বাঙালীর জাতি মিশ্রণতার স্বধর্মের মধ্যেই তার অন্তর্নিহিত মানস পরিচয় সহজলভ্য হবে। সেই জন্যই বাঙালীর ধর্মকর্ম ও দেব-দেবীর পরিচয় অনুসন্ধান আজকের দিনে একান্ত প্রয়োজনীয় গবেষণা কর্ম বলে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশের বনদেবতা বাঙালীর মানস জগতের এক অনুদ্‌ঘাটিত সত্যলোকের পরিচয় আমাদের কাছে নিয়ে আসবে। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিবর্তন প্রবাহ বাঙালীর দেবদেবী পরিকল্পনায় এবং মণ্ডনকলায় প্রতিভাত হয়েছে, এখানে তার যথার্থ বীক্ষণ।

"বস্তুতঃ বাঙালীর ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হইতেছে রাঢ়-পুন্ড্র-বংগ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কোমের এককথায় বাংলার আদিবাসীদেরই পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস।"৭ বাংলাদেশে পূজাপার্বণের অন্ত নেই। গাছ-পাথর, পশু-পক্ষী, প্রজননশক্তি, কৃষি, শস্য, ঘট পট, লিংগ-যোনী, ষষ্ঠী, মনসা, চন্ডী, শীতলা, বিশালাক্ষী, পঞ্চানন, বড়ামু, কুদ্রা, সিনি, ভৈরব, দক্ষিণরায়, বনবিবি, সিংবোঙ্গা, মারাংবুরু আরো অসংখ্য গ্রামদেবতা যুগ যুগ ধরে গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি প্রবাহকে সজীব করে রেখেছে। এই দেব-দেবী পরিকল্পনা ও পূজাচার বাঙালীর অধিমানসের বাস্তব সাক্ষী। বর্তমান গ্রন্থে তার সত্যস্বরূপ সন্ধানের যথার্থ প্রয়াস-পরিচয় থাকবে।

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যের জন্যই এখানকার সংস্কৃতিও বৈচিত্র্যময়

হয়ে উঠেছে। শুধু বাংলা কেন সমগ্র ভারতেও এই জনবৈচিত্র্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। ভারতের লোককথা আলোচনা প্রসঙ্গে Stith Thompson বলেছেন—"It (India) has had a long and varied history, and its people are of most diverse origins". বাংলাদেশের জনবিন্যাস প্রসঙ্গেও একথা সত্য। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অধিমানসিক শক্তি বাঙালী জাতিকে নিরন্তর এক করেছে। ঐক্যের রাখী বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে জানতে হলে লোকায়ত সংস্কৃতিকে প্রথমে অনুসরণ করতে হবে। কারণ লোকায়ত সংস্কৃতিই জাতির বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের মূল ভিত্তিভূমি। জনৈক গবেষক বলেছেন—"Folklore carries the blue-print of cultural process as if in Microcrom".[৮] কারণ লোক-সংস্কৃতিই চিরায়ত সংস্কৃতির বনিয়াদ। মর্তলোকের মাধুরী পাথেয় করেই আমাদের স্বর্গলোকে অভিসার।

বনদেবতার উৎস ও বিকাশ

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনবিকাশের ক্ষেত্রে আমরা উৎস থেকে আজ অনেক দূরে চলে এসেছি। অথবা যে উৎস আমাদের হৃদয়ের গভীরে, জীবনের অন্তর্মূলে, সমাজের মর্মে, তাকে সহজে দেখতে পাইনা। সেই মর্মলোকে যাত্রা করতে হবে দেবতার উৎস সন্ধানে। আদিমকাল থেকে দেব চেতনার পেছনে মানুষের সহজাত ভয়-বিস্ময় ও ভক্তি কাজ করেছে। আদিম মানুষ চার পাশের জগৎ-জীবন ও তার বিস্ময়কর প্রকাশকে দেখে কোথাও বিস্মিত হয়েছে, আবার কোথাও ভয়ে বিহ্বল হয়েছে। এই উভয় চেতনার ফলে অতিপ্রাকৃত শক্তির কল্পনা করেছে মানুষ। দৃশ্যমান বস্তুপুঞ্জকে আদিম মানুষ একদিকে যেমন সচল-সজীব মনে করেছে, অন্যদিকে তেমনি এদের শক্তিকে অতিপ্রাকৃত মনে করেছে। এই মনন-কল্পনার ফলে মানুষের জগতে এলো দৈবশক্তি। এই আদিম মনন-কল্পনার অন্য নাম ধর্ম (Religion)। যদিও ধর্ম এবং রিলিজিয়ন সমার্থক নয়। কেননা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম-চেতনার চিরায়ত রূপে পার্থক্য সুপ্রচুর। যদিও আদিম মানসিকতা এক এবং অভিন্ন। প্রাচীন সভ্যতা বিশারদ সি, ই, এম, জোয়াড় বলেন: "Early religious ideas might be described as a mixture of fear and

cupboard love."[৯] আদিম মানব-মানবী মনে করত প্রকৃতির বিস্ময়কর ও ভয়ংকর রূপ প্রকাশের পেছনে কোন এক অদৃশ্য শক্তি সতত সক্রিয়। এই অদৃশ্য শক্তি কিন্তু তাদের কল্পনায় একক রইলো না। হয়ে গেল বহু এবং বৈচিত্র্যময়। জোয়াডের ভাষায় বলা যায়—'But primittve man did not think of one god who was responsible for everything that took place, but of a number of gods, each for them ruling over a particular department of the world. For instancc, in Egypt where there was already some kind of civilization, one of the earliest known, some four thousand years ago, there was a great multiplicity of these gods, a god for the moon, a god for the sun, a god of darkness, a god even of learning. Many of these gods were animals; there was a cow goddess (Isis), a cat goddess (Bast), and so on"[১০] শুধু মিশরে কেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায়ও এই ধরনের দেব-দেবীর সন্ধান মেলে। মহেন-জো-দড়ো এবং হরপ্পার প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাবশেষ এই সত্যের প্রতি বাস্তব ইঙ্গিত করে। গোরু, বিড়াল ভারত তথা বাংলার লোকায়ত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় বিশেষ আসন অধিকার করে আছে। যেমন পঞ্চানন বা শিবের বাহন ষাঁড়, ষষ্ঠীর বাহন বিড়াল, শীতলার বাহন গাধা, বনবিবির বাহন বাঘ ইত্যাদি। প্রাচীনকালে এই জীব-জন্তুগুলিকে মানুষ একদিকে যেমন ভয় করত অন্যদিকে তেমনি ভক্তিও করত। আমাদের বিশ্বাস, প্রথমে বন্যপ্রাণীকে মানুষ ভয়ই করত। শ্রদ্ধা বা ভক্তি এলো অনেক পরে। সম্ভবত সেইজন্যই জোয়াড্ বলেছেন—"Fear in fact, was still the mainspring of religion"[১১] কারণ ভয় মানুষকে ভয়ংকরভাবে অভিভূত করে। ভক্তি বরং অন্তর থেকে স্বতোৎসারিত হয়। তবে রাজা যখন দেবতার আসন গ্রহণ করল তখন ভয় শ্রদ্ধা বা ভক্তি অবিমিশ্রভাবে মানব মনে প্রতিক্রিয়া করেছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—"গ্রামদেবতারা প্রাক্-আর্য গ্রামগোষ্ঠীর ভয়-ভক্তির দেবতা।" গ্রাম-দেবতা ছাড়াও অসংখ্য আঞ্চলিক দেবতা বাংলাদেশে দেখা যায়, যাদের উৎসও ভয়-ভক্তি বলে মনে হয়। বাংলার বনদেবতারা গ্রামের সীমা অতিক্রম করে এক একটা অঞ্চলে সুবিস্তৃত হয়েছে। যেমন দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণরায় আর বনবিবি,

মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে বনদুর্গা, রাঢ় অঞ্চলে বড়াম, কুদ্রা। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে বাংলাদেশে এদের বিকাশ ও বিস্তার একদিনে হয় নি, হতেই পারে না। কালক্রমে এক সুবিস্তৃত কালসীমার মধ্যে এদের বিকাশ ঘটেছে। কারণ লোকযান কোন সুনির্দিষ্ট কালসীমার ফসল নয়। বরং অতীতের হয়েও লোকযান চিরনবীন।

বৃক্ষপূজা বা বন্দনা সারা পৃথিবীতেই প্রচলিত রয়েছে। আদিম মানুষের কাছে দৃশ্যমান প্রকৃতিই প্রাণবন্ত। বৃক্ষজীবনে প্রাণ আছে বলেই আদিম মানুষ বৃক্ষকে কেন্দ্র করে রচনা করল দেবপ্রতিমা। প্রতিমা কল্পনার পূর্বে অবশ্য বহু বিচিত্র আচার ও সংস্কার এই দেব প্রতিমাব বাস্তবায়ণে সহায়তা করেছে। কারণ আচার ও সংস্কারই ধর্মের ভিত্তি দৃঢ় করেছে।[১২] সম্ভবত প্রাকৃতিক বস্তুপুঞ্জের গুণ ও রূপানুসারে আদিম মানুষ তাদের প্রতিরূপ কল্পনা করেছে। শিল্পমাত্রেই প্রতিরূপ সৃষ্টি করে। জীবজন্তুগুলি আবার প্রাকৃতিক, ভৌতিক শক্তির সঙ্গে আপন ভাবানুষঙ্গে সমগোত্রীয়তা লাভ করেছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন আমাদের দেশে দুর্গাপূজার উৎপত্তি বৃক্ষপূজা থেকে। প্রাচীনকালে তুরানীয়ানরা কণ্টক বৃক্ষ পূজা করত এবং তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করে এই কণ্টক বৃক্ষের সামনে বলি দিত। বাংলাদেশে বনদুর্গা (বনবিবি) থেকেই দশভুজা দুর্গা প্রতিমার সৃষ্টি হয়েছে। 'একস্যাম্ বহু ভবেব' — উপনিষদের পরমপুরুষের এই বাণীই সম্ভবত দেবতার বিশ্বযাত্রার মূলকথা।

আলোচ্যমান গ্রন্থে, বনদেবতা অর্থে বনজ পশু-পক্ষী, জীবজন্তু, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদিকেও গ্রহণ করেছি। বনাশ্রয়ী সব কিছুকেই আলোচনার অঙ্গীভূত করেছি। কারণ বনদেবতা কোন আকস্মিক সৃষ্টি নয়। কোন স্বয়ম্ভু কিছু নয়। বরং মানব-সভ্যতার বিবর্তন প্রবাহের অনিবার্য ফলশ্রুতি। ভারতীয় আরণ্যক সভ্যতায় যাকে দিব্যলোকের প্রতীক কল্পনা করা হয়েছে, সেই অরণ্যকে সামগ্রিকভাবে এখানে গ্রহণ করেছি। বন, বনাধিপ, বনস্পতি সমান শ্রদ্ধেয়। সর্ব-প্রাণবাদের আলোকে বন থেকে প্রাণের উৎসার। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত জন-গোষ্ঠীর মধ্যে বহু বনদেবতা আছেন। যেমন বনবিবি, বনদুর্গা, বনমা, বনকালী, দক্ষিণরায়, (দক্ষিণেশ্বর), কালুরায়, সোনারায়, বদরসাহেব, চণ্ডী, বাঘবীর, সিংবোঙ্গা (সাঁওতালদের), বুরুবোঙ্গা, বনকুমারী, বড়াম্, কুদ্রা, সিনি ইত্যাদি। ওরাওঁ ও মুণ্ডারীদের গ্রামে পবিত্র কুঞ্জ থাকে। 'পবিত্র কুঞ্জে' বনদেবতা থাকেন।

'পবিত্র কুঞ্জ' ছেদন করলে বনদেবতা ক্রুদ্ধ হবেন এটাই তাদের বিশ্বাস। কৃষি ও শস্য উৎসব উপলক্ষে পরম পবিত্রতার সঙ্গে 'পবিত্র কুঞ্জ' পূজা করা হয়। আমাদের দুর্গাপূজায় যে 'নবপত্রিকা' বা 'কলাবৌ' পূজা করা হয়, তাকে বৃক্ষ-বন্দনার সজীব নিদর্শন বলা চলে। অধিকন্তু দুর্গাকে মার্কণ্ডেয় পুরাণে শাকম্ভরী বলা হয়েছে। সুতরাং দুর্গাও বনদেবতার সংস্কৃত রূপ। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে দুর্গা হলেন 'বনদুর্গার' বিবর্তিত রূপ। দশ প্রহরণাদি পরবর্তীকালে পুরাণ-তন্ত্রাচার, শাস্ত্র-সংহিতা থেকে সংগ্রহ করে পুরোহিতেরা সংযোজন করেছেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে নারিকেলকে পবিত্র ফল মনে করা হয়। অনেকে ঐশ্বর্যের দেবী শ্রী-র ফল বলে মনে করেন নারিকেলকে। নারিকেল আবার উর্বরতার প্রতীক। পশু-পক্ষীর মত বৃক্ষও যে প্রাণবন্ত—এটা আদিম বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ফলেই বৃক্ষের সঙ্গে বৃক্ষের বিবাহ দেওয়া এবং প্রজনন শক্তি বৃদ্ধি করার এক ধর্মীয় প্রথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রত্যন্তে প্রচলিত আছে।[১৩] গ্রীসে, জার্মানীতে, ভারতে তার প্রভৃতি নিদর্শন আজও পাওয়া যাবে। স্যার জেমস্ ফ্রেজার বলেছেন—'From an examination of the Teutonic words for 'temple' Grimm has made it probable that amongst the Germans the oldest Sanctuaries were natural woods. However that may be, tree worship is well attested for all the great European families of the Aryan stock'.[১৪]

বাংলার ব্রতে, লোকাচারে, পাল-পার্বণে বৃক্ষ-লতা-পুষ্প-ফলের অফুরন্ত উপাচার অনিবার্যভাবে প্রয়োজন হয়। প্রকৃতি যে কত গভীরভাবে বাঙালী মানসে প্রভাব বিস্তার করেছিল—এই প্রবণতা ও মানসিকতা তারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাংলার গ্রামান্তরে পথে পথে পরিক্রমা করলে প্রত্যেকের নজরে পড়বে অসংখ্য বৃক্ষাশ্রয়ী 'থান'। বৃক্ষবিহীন 'থান' কল্পনা যেন ভারতবর্ষে অসম্ভব। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—"বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুন্নত পল্লী অঞ্চলে কোথাও কোথাও এখনো পথে-ঘাটে বনে-জঙ্গলে গাছতলায় পুকুরের পারে খেত-খামারে নানা রকম অপৌরাণিক লৌকিক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত আছে। ক্ষেত্রপাল কালিয়া-দানা হেঁটাল-চণ্ডী নেকড়াই-চণ্ডী ঝকরাই-চণ্ডী কেঁতাই-চণ্ডী দিদি-ঠাকরুণ সন্ন্যাসী-ঠাকুর ইত্যাদি এই জাতীয় দেবতা।…সমাজের নিম্নস্তরে তখন অনার্য প্রথামত স্থানীয় দেবদেবী-উপদেবতার পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত

ছিল। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ কোনো কোনো দেবদেবীস্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে।"[১৫] সুদীর্ঘকালের ধর্মীয় আচার-সংস্কার ইত্যাদির বিবর্তনের ফলে বাংলা তথা ভারতবর্ষে দেব-দেউল ও দেব-দেবীর প্রতিমার পরিণত রূপ আজকে সহজলভ্য হয়েছে। মাটির ঢেলা, ত্রিকোণাকৃতি পাথর অথবা গোলাকার পাথর, বৃক্ষের গুঁড়ি, মাটির পুতুল (ঘোড়া, হাতি ইত্যাদি) ইত্যাদির রূপ ক্রমাগত এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিল। সুন্দরের প্রতি মানুষের এষণা চিরন্তন। এইরূপ এষণার ফলে মানুষী প্রতিমা গড়ে উঠল এক একটি দেবতার। লৌকিক দেবতাদের মূর্তি সেকথার সত্যতা প্রমাণ করছে।

মূর্তি মাত্রেই প্রতীক। বৌদ্ধরা মূর্তিকে কল্পনার অতীত, স্বর্গীয় বলে মনে করেন। দেবতার উৎপত্তিস্থান হিসাবে বৌদ্ধরা নির্দেশ করেন অনাদি অনন্ত শূন্যতা বা বজ্র।[১৬] পুরাতত্ত্ব ও পুরাকথার গবেষকেরা মনে করেন দেবতা চিন্ময়; ভাবাত্মিকা। কিন্তু একথা সত্য যে কৃষি-ফলন, বৃক্ষ-প্রজনন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত দেবদেবীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এবং প্রত্যেকের নিজস্ব নামকরণ সেই বিশিষ্ট প্রকৃতির দ্যোতনা করে। শব্দ, প্রাচীন বিশ্বাস মতে, জাদু বা ইন্দ্রজালের উপায়মাত্র। এই শব্দ থেকে কালক্রমে চিত্র এলো মানুষের মননে ও মানসে।[১৭] এই চিত্র প্রতিমা লক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রতিমাকে করলো অলংকৃত। প্রতিমার হাতে দিল প্রহরণ। কারণ দেবদেবীরা রক্ষা করবেন আপন আপন দিগ্ বা ক্ষেত্র। দেবতার এক্তিয়ার এইভাবে সুচিহ্নিত হয়ে গেল। ভারতবর্ষের ইন্দ্র, বরুণ, বসুন্ধরা; গ্রীসের এটিশ, দ্রুইদ্ বাস্ট ইত্যাদি সেই দেবতার শক্তি-সীমার নিদর্শন। বাংলার বনদেবতারা বনভূমির চতুর্সীমার মধ্যে আপন প্রতাপ সীমিত করেছেন। এই সীমায়ণ একান্তভাবেই লৌকিক মানবগোষ্ঠীর ধর্ম-দেব কল্পনার ফলশ্রুতি। একদিকে প্রাণবাদ আবার অন্যদিকে মনবাদ এই উভয় চেতনার টানাপড়েনে ধর্মের সৃষ্টি হল পৃথিবীতে। অবশ্য নৃতত্ত্ববিদ্ ও সমাজতত্ত্বের গবেষকদের মধ্যে এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। জেমস্ ফ্রেজার বলেন, ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিক ধর্মের পূর্বসূরী। ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদ্ বিজয়চন্দ্র মজুমদার বলেন, প্রাগু-প্রাণবাদে ধর্মের বীজ নিহিত। সর্বপ্রাণবাদ ও জড়াত্মাবাদ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। তবে

একথা আজ গবেষক মহলে স্বীকৃত যে ধর্মের পূর্বে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হয়েছিল। ইন্দ্রজাল আবার প্রকৃতিলোকে প্রাণসত্তার আরোপ করেছে। প্রাণবাদ ও ইন্দ্রজাল যুগপৎ ধর্মের রূপায়ণের অন্তরালে বিশেষ শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। সহানুভূতিমূলক ও স্পর্শমূলক জাদুর ফলেই দৈববিশ্বাস ও সংস্কার-আচার ইত্যাদির জন্ম হয় পৃথিবীতে।

বাংলাদেশের বনদেবতাদের মূর্তি বা প্রতিমা এখনও চরম পরিণতি লাভ করেনি। এমন অনেক পূজাচার আছে যেখানে শুধুমাত্র বৃক্ষ বা বৃক্ষশাখাই পূজিত হয়। যেমন মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও সিংভূমের করম পূজা। শুধুমাত্র একটি করম শাখাকেই দেব-প্রতীক কল্পনা করে এখানকার করম পূজা উদ্‌যাপিত হয় ভাদ্রসংক্রান্তিতে। চট্টগ্রামে কার্তিক সংক্রান্তিতে কার্তিক পূজা উপলক্ষে "কার্তিকের বানা" নামক যে ধানের নবাঙ্কুর পূজা করা হয়, তা মূলত শস্য বন্দনা এবং শস্যের প্রতীক মাত্র। মূর্তি বা প্রতিমা সৃষ্টির ব্যাপারে আর্যভাবনা যে যথেষ্ট কাজ করেছিল—এটা নিঃসন্দেহ। দেবার্চনার ক্ষেত্রে পূজা ও হোমের যে মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, তা আর্য-অনার্যের মিলনের ও সমন্বয়ের ফলশ্রুতি।[১৮] দ্রাবিড় ও আর্য ভাষাগোষ্ঠীর সমন্বিত ফল পূজা ও হোম। সুতরাং মনে হয় দেব কল্পনার ক্ষেত্রে এদের অবদান অপরিসীম।

ভারতের চিরায়ত মূর্তিশিল্প প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "শিল্পকারগণ মূর্তিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—নর, ক্রুর, আসুর, বালা এবং কুমার।

নর—নরনারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, বাণ, বলী, ইন্দ্র, ভার্গব, অর্জুন প্রভৃতি।

ক্রুর—চণ্ডী, ভৈরব, নরসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ ইত্যাদি।

আসুর—হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, নমুচি, নিশুম্ভ, শুম্ভ, মহিষাসুর, রক্তবীজ ইত্যাদি।

বালা—বটকৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি।

কুমার—উমা, বামন, কৃষ্ণসখা ইত্যাদি।"[১৯]

ভঙ্গির দিক থেকেও মূর্তিগুলি আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে। যেমন—সমভঙ্গ, আভঙ্গ ও অতিভঙ্গ।[২০] বাংলার লৌকিক দেবদেবীর ক্ষেত্রে এই নিয়ম যথাযথ অনুসরণ করা হয় না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে শিল্পী লৌকিক ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে মূর্তি গড়েন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "চিত্র এবং

আল্পনা, বালি মাটি ও পিটুলি দ্বারা রচিত মূর্তি বা প্রতিমা, লক্ষণহীন হইলেও দোষের হয়না।" বাংলার লোকায়ত স্তরে যেহেতু এই সকল উপকরণের প্রাধান্য অত্যধিক, সেই জন্যই মূর্তিশিল্পের শাস্ত্রীয় অনুশাসন এখানে ততটা কঠোর নয়। লোকধর্মের সঙ্গে বাংলার শিল্পের অন্তরঙ্গ যোগ রয়েছে বলেই শিল্পীর কল্পনা লোকানুগ। বিশেষত পললময় নদী তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে মাটির পুতুল-প্রতিমার প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ থেকে মহেন-জো-দড়ো সভ্যতা পর্যন্ত একই ভাব-চেতনা লক্ষ্য করা যায় পুতুল-প্রতিমার গড়নে ও ধর্ম বিশ্বাসে। আবার মহেন-জো-দড়ো থেকে মিশর পর্যন্ত একই ভাবনার যেন ক্রম প্রসার। সেই জন্যই মেক্সিকোর শস্যদেবতার সঙ্গে বাংলাদেশের টুসুর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের লোকধর্মই হল বাংলার পুতুল-প্রতিমা শিল্পের প্রধান উৎস। ঘট-পট-পুতুলের সীমা ছেড়ে দেবতা একদিন হল মানুষ। এই মানুষী রূপ লাভ করার পেছনে বাংলার লোকসমাজের রূপ সচেতনতা ছিল প্রখর এবং সক্রিয়। বাংলাদেশের বনদেবতারা বনময় অঞ্চলকে আশ্রয় করেই উৎসারিত ও বিকশিত। দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন ও পূর্ববঙ্গের বনাঞ্চল, উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চল এবং রাঢ় অঞ্চলের বনভূমি বন-দেবতাদের আশ্রয়স্থল। অধিকন্তু এই বনদেবতারা বনাঞ্চলের হিংস্র শ্বাপদগুলিকে নিজেদের বাহন করেছেন। মনে হয়, এই হিংস্র শ্বাপদগুলি (যেমন সাপ, বাঘ, কুমির ইত্যাদি) প্রথমে লোকসমাজের ভয়ের উৎস ছিল। পরে এরা লোক-সমাজের কাছে পূজা পেয়ে আসছে। কালক্রমে যখন বনদেবতার সৃষ্টি হল, তখন বনদেবতার বাহন হিসেবে বাঘ, ঘোড়া, সাপ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল। এই জীব-জন্তুগুলি আবার প্রাচীন কোম বাঙালীর 'টোটেম' বা কৌলচিহ্নরূপে পূজিত হত। 'টোটেম' অতি পবিত্র এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চনীয়—এই মনোভাব থেকেই 'টোটেম' জীব-জন্তু দেবতার আসনে উন্নীত হল। ফলে এরা দেবতার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেল। ভাবানুষঙ্গে এক একজন লৌকিক দেবতা এক একটি জীব-জন্তুকে বাহন করে নিলেন। লোকসমাজই এই নির্বাচন করে দিয়েছিলেন। সমাজের অধিমানসিকতা গুণানুসারে এবং পরিবেশানুসারে দেবতার বাহন ও প্রহরণ নির্বাচন পালা শেষ করেছে। যেমন দক্ষিণরায়ের বাহন বাঘ, মনসার সাপ, বনবিবির বাঘ, বড় খাঁ গাজীর ঘোড়া ইত্যাদি। এইভাবে দেবতা ও বাহন পূজার উপযোগী হয়ে উঠল লোকায়ত

বাংলায়। দুর্গা প্রতিমার ক্ষেত্রে দেখেছি—সিংহ, মহিষ, ময়ূর, পেঁচা, ইঁদুর, ষাঁড়, হাঁস ইত্যাদি এক একজন দেবতার বাহন হয়ে উঠেছে। আবার ভিন্ন ভিন্ন দেবতার প্রহরণও স্বতন্ত্র। যেমন কার্তিকের তীর ও ধনুক ও লক্ষ্মীর ধানের শীষ ইত্যাদি। কেউ আবার দ্বিভুজা, আবার কেউ কেউ চতুর্ভুজা বা দশভুজা। শক্তি কল্পনার তারতম্যের জন্যই এই বৈচিত্র্য সম্ভব হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ-রায়ের হাতে তীর-ধনুক, পিঠে তূণীর ও ঢাল দেখা যায়। যুদ্ধের দেবতা কার্তিকের সঙ্গে কিছু মিল রয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু উভয়েই এক নন। উভয়ের ধর্ম-মানসিকতা স্বতন্ত্র। কার্তিক শাস্ত্রীয়, দক্ষিণরায় 'অন্যব্রত' কর্তৃক পূজ্য। একজন বনদেবতা অন্যজন যোদ্ধা। বাংলার বনদেবতাদের মধ্যে বনবিবি, বনদুর্গা, কালভৈরব, বাশুলী, ক্ষোধাসিনি ও 'সিনি' অন্তিক লোক দেবতামন্ডল, আটেশ্বর, রংকিনী, সোনারায়, বারাঠাকুর, দক্ষিণরায়, রুদ্রা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞদের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধে এই দেবমন্ডলীর বিবরণ ও বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করব।

১। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) ঃ নীহাররঞ্জন রায়। পৃষ্ঠা ৮৬

২। প্রাচীন বাঙালী ঃ সুকুমার সেন। পৃষ্ঠা ১-২

৩। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) : পৃষ্ঠা ১৩৪

৪। যেমন বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ, পুন্ড্রাঃ, গৌড়াঃ ইত্যাদি

৫। বিনয় সরকারের বৈঠকে (প্রথম খন্ড) ঃ পৃষ্ঠা ৫৮৩

৬। 'ইতিহাস রচনার সাম্প্রতিক একটি পদ্ধতি' / পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : পৃষ্ঠা ৭৮০

৭। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) ঃ পৃষ্ঠা ৫৭৫

৮। Folklore : vol. 70 : 1959. (London.)

৯। The story of civilization : C. E. M. Joad. page 20.

১০। Ibid : pages 20-21.

১১। Ibid : page 24.

১২। Ritual formulae always contain information about the history of religion. Oral tradition : Jan Vansina, London, 1965. page 147.

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঃ সুন্দরবন

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

চব্বিশ পরগনা জেলা বা এর অংশবিশেষের ইতিহাস-বিবৃতির পূর্বে পটভূমিকা প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। এ জেলার নামটি বিচিত্র অভিনব এবং আধুনিক। এরূপ সংখ্যাযুক্ত নাম এদেশের অপর কোন জেলার নেই। এর কারণ বিষয়ে বলছি, এ জেলার নামকরণ হয়েছিল বিদেশী ইংরেজদের দ্বারা এবং মাত্র দু'শ বৎসর পূর্বে। যে ভূসীমাকে বর্তমানে চব্বিশ পরগনা জেলা বলা হয়; ভারতে মুসলমান যুগ থেকে ইংরেজ অধিকারের প্রথম কাল পর্যন্ত তার পরিচয় ছিল যশোর রাজ্যের দক্ষিণ অংশ বা 'দক্ষিণ-যশোর'; চব্বিশ পরগনা বলে কোন স্থানের পরিচয় ছিল না। তবে মুসলমান আমলে, শাসন ও কর আদায়ের সুবিধার জন্যে রাজ্য (বা প্রদেশ)-কে 'সরকার' 'মহল' 'পরগনা' 'তশিল' প্রভৃতি বড় ছোট অংশে ভাগ করা হত। 'সরকার' ছিল বৃহৎ বিভাগ, ঐ সময় সরকার সাতগাঁর সীমার অধীনে বহু ছোট ছোট বিভাগ বা 'পরগনা' ছিল।

মুঘল রাজত্বকালে বাদশাহদের অধীন বাংলাদেশ শাসক বা নবাবদের খাস সম্পত্তি হত, কলকাতাকে কেন্দ্র করে পরস্পর সংলগ্ন ২৪টি পরগনা, এর সমষ্টিগত পরিচয় ছিল 'কলিকাতার জমিদারী'।

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর বাংলার নবাব হয়ে লর্ড ক্লাইভকে উক্ত জমিদারী উপঢৌকন দেন, পরে সে জমিদারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারে আসে। লর্ড হেস্টিংস উক্ত ২৪টি পরগনা একত্র করে একটি জেলা গঠন করেন,

তখন এই সমষ্টিগত স্থানের নাম হয় 'চব্বিশ পরগনা জেলা'। এ জেলার সমস্ত স্থান মুসলমান যুগে 'সরকার সাতগাঁ'র মধ্যে ছিল।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা'। ইংরেজ পূর্বকালে এই অংশের মুসলমানী 'পরগনা' গুলির উল্লেখ করছি।

'মেদিনীমল' : বারুইপুর-রাজপুর-হরিনাভি-চণ্ডীপোতা, কোদালিয়া প্রভৃতি স্থান মেদিনীমল পরগনার এলাকাধীন ছিল।

যেমন হাজিপুর অর্থাৎ ডায়মন্ডহারবার অঞ্চল ছিল 'মুড়াগাছা' 'প্যাঁথাকুলি' পরগনার অধীনে, পলাবাটী-বরিদহাটী পরগনার মধ্যে ছিল জয়নগর-মজিলপুর ও তার আশপাশের স্থান বা পল্লীগুলি, হাতিয়াগড়, ময়দা মাগুরা পরগনার এলাকা ছিল দক্ষিণ বারাসাত থেকে ছত্রভোগ বন্দর পর্যন্ত, 'খাড়ি-দক্ষিণসাগর-সাতাল' পরগনার অধীনে ছিল এ জেলার দক্ষিণতম অংশ বা সুন্দরবনের বসতি অঞ্চল। পূর্বোক্ত ২৪টি পরগনারই মত কলকাতা ও তার সন্নিকট শতাধিক পল্লীর সমষ্টিগত পরিচয় ছিল 'পঞ্চান্ন-গ্রাম'। এই পঞ্চান্ন গ্রামের কতক স্থানের অবস্থান ছিল পরবর্তীকালে চব্বিশ পরগনা নামে পরিচিত ভূভাগের মধ্যে।

ইংরেজ আমল থেকে বর্তমানে আলোচ্য অঞ্চল আলিপুর এবং ডায়মন্ডহারবার মহকুমার মধ্যে। প্রসঙ্গত একটি কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গত শতাব্দীর মধ্যভাগের পর কিছুকাল বারুইপুর একটি মহকুমা হয় কয়েক বৎসরের জন্য, ১৮৬৪ সালে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুর মহকুমার শাসক বা আধিকারিক ছিলেন।

বর্তমান প্রবন্ধের পটভূমিকা হিসাবে আলোচ্য অঞ্চলের যে ভৌগোলিক বিবরণ দিয়েছি সেগুলি মধ্য ও বর্তমান যুগের। এবার উক্ত অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে আলোচনার প্রারম্ভে প্রাচীনযুগের ভৌগোলিক অবস্থানের বিষয় উল্লেখ করছি।

এদেশে হিন্দু রাজাদের অধিকারকালে দেশ ভাগ করা হত 'ভুক্তি' 'বিষয়' ও 'মণ্ডল' প্রভৃতি বিভাগে। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিভাগ ছিল 'ভুক্তি' (প্রদেশের মত), 'বিষয়' ও 'মণ্ডল' ছিল ভুক্তির অন্তর্গত (জেলা বা মহকুমার মত) স্থান। সমগ্র চব্বিশ পরগনা (এবং অপর বহু স্থান) ছিল পৌন্ড্রবর্ধণ ও বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত এবং আলোচ্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ছিল 'খাড়ি' বা 'খটিকা' বিষয় ও মণ্ডলের এলাকাধীন স্থান।

আলোচ্য অঞ্চলের (বা সমগ্র চব্বিশ পরগনা জেলা যে ভূখন্ডে অবস্থিত সে স্থানের) প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় এর দক্ষিণ প্রান্তিক অংশে, অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর তীরস্থ গভীর অরণ্যরাজ্যের সীমার মধ্যে। বহু প্রাচীনকাল থেকে সুন্দরবন ভয়াবহ স্থান বলে পরিচিত হয়ে আসছে।

এই অরণ্যরাজ্যের অতীত ইতিহাস গৌরবজনক।

রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে আলোচ্য অঞ্চলে অবস্থিত গঙ্গাসাগর সঙ্গম তীর্থের কথা শুধু নয়, ঐ ভূভাগের প্রাচীন যুগের শক্তিশালী অধিবাসী ও স্বাধীন জনপদের উল্লেখও দেখা যায়।

মহাভারতে উল্লেখ আছে, পঞ্চপান্ডব সাগরতীর্থে পুণ্যস্নান সমাপন করে কলিঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করেন।

মহাভারতে অন্যত্র বর্ণিত আছে, মধ্যম পান্ডব ভীম দিগ্বিজয় অভিযানকালে রসাতলে বা বঙ্গোপসাগর কূলে উপস্থিত হলে সে স্থানের ম্লেচ্ছ অধিবাসীরা তাঁর সঙ্গে মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করেছিল।

আর্য সাহিত্যে বঙ্গোপসাগর কূলস্থ স্থান বা গঙ্গাসাগর সঙ্গম অঞ্চলকে 'রসাতল' 'পাতাল' এবং ঐ ভূভাগের অধিবাসীদের 'ম্লেচ্ছ' 'শবর' প্রভৃতি বলা হয়েছে। তার কারণ ঐ ভূখন্ড ছিল পূর্ব ভারতের অপর অংশ অপেক্ষা নিচু, দুর্গম, বিচ্ছিন্ন এবং স্থানীয় অধিবাসীরা ছিল আর্যেতর সম্ভবত অস্ট্রিক অথবা দ্রাবিড় ভাষী।

এই সাগরদ্বীপ বা বঙ্গোপসাগর কূলস্থ অঞ্চলের প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গে দু'টি বিষয়ের অবতারণা করছি।

প্রাচীনকালে খৃষ্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী পূর্বে, পূর্ব ভারতের দক্ষিণতম অংশে বা গাঙ্গেয় বদ্বীপে গঙ্গারিডি নামে এক পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল, সে বিষয়ে জানা যায় খৃীঃ ১ম-২য় শতকে জনৈক গ্রীক নাবিকের সমুদ্রযাত্রা বিবরণী (Pariplees of the Erathreau sea গ্রন্থ) থেকে এবং গ্রীক টলেমি সম্পাদিত মানচিত্র লক্ষ্য করে একটা ধারণা বা অনুমান করা যায়। উক্ত গঙ্গারিডি রাষ্ট্র বা তার অংশ-বিশেষ আলোচ্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মধ্যে ছিল এবং উক্ত রাজ্যের রাজধানী 'গঙ্গে'র অবস্থান ছিল গঙ্গাসাগর সঙ্গম অঞ্চলে।

কিন্তু উক্ত রাজ্যের বিন্দুমাত্র নিদর্শন বা সে সময়ের অধিবাসীদের কোন বংশধরের সন্ধান পাওয়া যায় না। ঐ পরাক্রান্ত রাজ্য নিশ্চিহ্ন হল কি করে?

কোন শত্রুর আক্রমণে তা হতে পারে না। প্রসঙ্গত একটা কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়, এ অঞ্চলের একটি ভৌগোলিক বিবরণ থেকে জানা গিয়েছে, বহু শতক পূর্বে বঙ্গোপসাগর কূলে একপ্রকার প্রচণ্ড ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস হয়, তার ফলে ঐ অঞ্চলের বহু ক্রোশ ব্যাপী স্থান ভূগর্ভে অকস্মাৎ নিমজ্জিত হয়ে যায়। বঙ্গোপসাগর তীরস্থ ঐ ভূমি অবনমনের ফলে হয়ত গঙ্গারিডি রাজ্য শোচনীয়ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা সত্যি ঘটেছিল কিনা, তার কোন ইতিহাস বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়নি। তবে এটা অনুমান মাত্র।

দ্বিতীয় কথাটি বলি, বর্তমান ত্রিপুরার রাজবংশের পূর্বপুরুষগণ আদি কালে গঙ্গাসাগর দ্বীপ বা ঐ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন এবং অধিবাসী ছিলেন, পরে ঐ বংশের জনৈক রাজা প্রতর্দন ব্রহ্মনদের তীরে কিরাত রাজ্য অধিকার করেন। সেই রাজ্যের নাম হয়ে যায় ত্রিপুরা রাজ্য। এ বিষয়ে স্পষ্টভাবেই জানা যায় বর্তমান ত্রিপুরা রাজ দরবারে রক্ষিত 'রাজরত্নাকরম্' পুঁথি (পরে মুদ্রিত) বা কুলুজি গ্রন্থ থেকে। শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থেও এই অভিমতের কিছু সমর্থন পাওয়া যায়।

আলোচ্য অঞ্চলের প্রান্তিক সীমা হল, বঙ্গোপসাগর তীরের অরণ্যময় রাজ্য বা সুন্দরবন. এই বনভূমির মধ্যে থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মৌর্য-সুঙ্গ-শক-কুষাণ-গুপ্ত-পাল-সেন যুগের সভ্যতার বহু নিদর্শন। দক্ষিণতম চব্বিশ পরগনায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এবং হাসিলের ফলে পাওয়া গিয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তর ও অস্থি নির্মিত বহু প্রকার হাতিয়ার বা অস্ত্রশস্ত্র, হিন্দু রাজাদের অধিকার কালের শতশত হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন দেবদেবীর প্রস্তর মূর্তি, ধাতুনির্মিত মুদ্রা, সেনযুগের তাম্রশাসন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য খাড়ি অঞ্চলে বকুলতলা থেকে প্রাপ্ত মহারাজা লক্ষ্মণের তাম্রলিপি এবং রাজা ডোম্বনপাল দেবের রৌপ্যমন্ডিত অনন্যসাধারণ তাম্রশাসনটি। এ দুটিই দ্বাদশ শতকের। সুন্দরবনের অরণ্য হাসিলের ফলে দেখা গিয়েছে বহু মঠ, মন্দির, স্তম্ভলিকার ধ্বংসাবশেষ। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বর্তমনে খাড়ি সন্নিকট 'হটা' নামক স্থানের পালযুগে নির্মিত মন্দির। ঐতিহাসিকদের নিকট 'জটার দেউল' বলে বিশেষ পরিচিত। জটার দেউলটি বর্তমানেও কিছু পরিমাণে অক্ষত অবস্থায় আছে, এটি নির্মিত হয় খ্রীস্টীয় দশম শতকে জনৈক রাজা জয়ন্তচন্দ্র কর্তৃক, এ কথা জানা গিয়েছে জটাপল্লী থেকে গত

শতব্দীতে প্রাপ্ত একটি তাম্রলিপি পাঠে। উক্ত মন্দিরটি বর্তমানে প্রায় ৮০ ফুট উচ্চ।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়, বারুইপুরের নিকট 'আটমরা' নামক পল্লী থেকে বহু প্রাচীন প্রত্নবস্তু এবং দক্ষিণ গোবিন্দপুর থেকে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন সম্পাদিত একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে।

আলোচ্য স্থানের অর্থাৎ ঐ জেলার সীমান্ত অঞ্চলের বা বঙ্গোপসাগর কূলের সভ্যতা কখনো স্থায়ী হয়নি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে ও জলোচ্ছ্বাসে, নদনদীর ধারা লুপ্ত হওয়ায় এবং ভূমির অবনমনে, পরে মধ্যযুগে মগ-ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারে পুরাকালের সভ্যতা বা জনপদ নষ্ট হয়ে যায় বারবার, পরে জনশূন্য হলে অরণ্যে আবৃত হয়। তাহলেও মধ্যযুগে এই সীমার মধ্যে বিখ্যাত বন্দর ও ত্রিপুরাসুন্দরীদেবীর পীঠস্থান তীর্থ ছত্রভোগ এবং খাড়ি অঞ্চল একেবারে ধ্বংস বা অরণ্যাবৃত হয় নি। খ্রীঃ ষোড়শ শতকের প্রথম দশকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই ছত্রভোগ বন্দর থেকে নৌকাযোগে ফলাফল গমন করেছিলেন এবং ঐ শতাব্দীর শেষ পাদে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্তরায় খাড়িতে স্বীয় বাসস্থান নির্মাণ করেছিলেন। বসন্তরায়ের প্রাসাদের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না, তবে তার পূজিত কয়েকটি দেবতা ও বিগ্রহের সন্ধান মেলে। জয়নগরে বিখ্যাত রাধাবল্লভ বিগ্রহটি তার মধ্যে অন্যতম। খাড়ি এখন নগণ্য পল্লী। ছত্রভোগও তাই, এখানে বন্দরের কোন নিদর্শন দেখা যায় না। তবে প্রাচীন কালের ত্রিপুরাদেবীর বিগ্রহ ও (পরবর্তীকালে নির্মিত) মন্দির আছে, নিত্য পূজা হয়।

আলোচ্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গৌরবজনক প্রাচীনযুগীয় ইতিহাস কিছু বর্ণনা করে ঐ স্থানে মধ্যকালের কথা বলছি। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, এ স্থানে মধ্যযুগের সভ্যতার ঐতিহাসিক নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায় না, যা পাওয়া গিয়েছে সেগুলি সাহিত্যগত প্রমাণ। মধ্যযুগে রচিত যেসকল সাহিত্যে বা কাব্যে আলোচ্য অঞ্চলের ঐ সময়ের উল্লেখ দেখা যায় সেগুলি থেকে জানা যায় এই স্থানের মধ্যযুগের জনপদের কিছু বিবরণ। জানা যায়, অধুনালুপ্ত গঙ্গানদীর বিভিন্ন ধারা, ভৌগোলিক পরিবেশ এবং সংস্কৃতির বহু কথা।

খ্রীঃ ষোড়শ শতকে রচিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ দুটি থেকে জানা যায়, শ্রীচৈতন্য সপার্ষদ এই আলোচ্য স্থান দিয়ে নীলাচলে গমন করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে জগন্নাথ দর্শনের উদ্দেশে শান্তিপুর থেকে আটিসারা (বারুইপুর নিকটস্থ) গ্রামে আসেন। 'শ্রীচৈতন্য ভাগবতে' আছে ঃ

হেন মতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে।
উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরেতে ॥
সেই আটিসারা গ্রামে মহা ভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম ॥

মহাপ্রভু আটিসারা পল্লীতে একরাত অনন্ত পন্ডিতের গৃহে অবস্থান করে ছত্রভোগ বন্দর অভিমুখে যাত্রা করেন।

এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহা কুতূহলে ॥
ছত্রভোগে গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গ ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে ॥

মহাপ্রভু চারজন সঙ্গী (নিত্যানন্দ, পন্ডিত জগদানন্দ, দামোদর পন্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ) সহ ছত্রভোগ বন্দরে উপস্থিত হয়ে মর্মাহত হলেন, কারণ ঐ বন্দরে একখানিও নৌকা দেখা গেল না। কি উপায়ে নীলাচলে যাবেন? বন্দর নৌকাশূন্য হবার কারণ, ঠিক ঐ সময় বাংলার শাসক সুলতান হুশেন শার সঙ্গে পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ চলছে। হুশেন শার আদেশে উড়িষ্যার সঙ্গে যোগাযোগের সব পথ বন্ধ করা হয়েছে, তাই বন্দরে নৌকা নেই। মহাপ্রভু এ কথা জেনে বালকের মত ক্রন্দন করতে লাগলেন। ভক্তের ডাক ভগবান শুনতে পান। ঐ প্রান্তিক অঞ্চলের অধিকারী বা সুলতানের যুদ্ধকালীন অঞ্চলরক্ষক পদস্থ কর্মচারী রামচন্দ্র খাঁ মহাপ্রভুর দেবতাসুলভ আকৃতি দেখে ও তাঁর ব্যাকুলতার কারণ শুনে, নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রভুর নীলাচলে যাবার জন্য একটি নৌকার ব্যবস্থা করেছিলেন অতি গোপনে। আশান্বিত হয়ে শ্রীচৈতন্যদেব আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

উক্ত অনন্ত পন্ডিত প্রতিষ্ঠিত গৌর নিতাই বিগ্রহ আজও আটিসারায় আছে।

মধ্যযুগে রচিত কয়েকটি মঙ্গলকাব্যে আলোচ্য অঞ্চলের বহু পল্লীর বর্ণনা দেখা যায়। মঙ্গলকাব্যের কবিরা দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে সময় সময় কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন বা অতিশয়োক্তি করেছেন, কিন্তু বাস্তব ব্যাপারে

যথাযথ লিখে গেছেন, সেই কারণে মঙ্গলকাব্যগুলির ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক মূল্য আছে।

খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকে বিপ্রদাস রচিত 'মনসার ভাসান' কাব্যে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যে যাত্রা প্রসঙ্গে আছে ঃ

কালীঘাটে চাঁদরাজা কালিকা পূজিয়া।
চূড়াঘাটে বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া॥
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতূহলে।
বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে॥
নুলিয়ার গাঙ বাহি চলিল ত্বরিত।
ছত্রভোগে গিয়া রাজা চাপায় বুহিত॥

খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতকে মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্য যাত্রা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে ঃ

কালীঘাট এড়াইল বেনের নন্দন।
কালীঘাটে ডিংগা দিল দরশন॥
তীরের প্রয়ান যেন চলে তরিবর।
তাহার মেলানি বাহে মাইনগর।
নাচনগাছা, বৈষ্ণবঘাটা বামদিকে থুইয়া।
দক্ষিণেতে বারাসত গ্রাম এড়াইয়া॥
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
ছত্রভোগে উত্তরিল অবসান বেলা॥
সাগর সংগমে দেখি কান্ডারের রঙ্গ।
কহে সাধু শ্রিয়পতি সাগর প্রসঙ্গ॥

রায়মঙ্গল (বা ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়মঙ্গল) পূর্বোক্ত মঙ্গলকাব্যগুলির পরে রচিত হলেও এর রচয়িতা কৃষ্ণরাম দাস ছিলেন এ জেলার অধিবাসী, সেই কারণে তাঁর কাব্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়। রায়-মঙ্গলে রয়েছে ঃ

(ধনপতি সদাগরের বিদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাগমন)

সারিগায় জুড়ি জুড়ি কাকদ্বীপ গজঘড়ি ছাড়াইল বণিকের রাজে।

টীয়াখোল পাছু আন গংগাধারায় করি স্নান উপনীত হইল ছত্রভোগে ॥
অম্বুলিঙ্গ মহাস্থান নাহিয়ার উপমান বন্দিল তথায় বিশ্বনাথ।
বাদ্য বাজে সুমধুর বাহিয়া হাজা বিষ্ণুপুর জয়নগর করিল পশ্চাত ॥
সঘনে দামামা ধ্বনি ভাবি রায় গুণমণি বড়ুক্ষেত্র বাহিল আনন্দে।
বারাসতে উপনীত হইল সাধু হরষিত পূজিল ঠাকুর সদানন্দে ॥
সাধুঘাটা পাছে করি সূর্যপুর বাহে তরী চাপাইল বারুইপুরে আসি।
বিশেষ মহিমা বুঝি বিশালাক্ষী দেবী পূজি বাহে তরি সাধু গুণরাশি ॥
মালঞ্চ রহিল দূরে বাহিয়া কল্যাণপুর কল্যাণমাধবে প্রণমিল।
বাহিলেক যত গ্রাম কি কাজ করিয়া নাম বড়দহ (রাজপুর) ঘাটে উত্তরিল ॥

'পীরানী' ঃ একটি লৌকিক দেবতা

'মাইবিবি হাট' নামটি মাইবিবি নামানুসারেই হয়েছে। মাইবিবি অর্থাৎ বিবিমাই, পরে লোকমুখে দাঁড়ালো 'মাইবিবি'। কেউ কেউ বলেন, মায়া বা ছলনাধারিণী বিবি থেকেই মায়াবিবি হয়েছে। এই বিবি হলেন ওলাবিবি।

ওলাবিবি এক কাল্পনিক পীরানী। পীরগণকে যেভাবে লোকে মান্য করেন, হাজত, মানত বা শিরনি প্রদান করেন, ওলাবিবিও অনুরূপভাবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ভক্তি-অর্ঘ্য পেয়ে থাকেন।

ওলাবিবি হিন্দুদের এক লৌকিক দেবী। শুধু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় নয়, উত্তর চব্বিশ পরগনা, কলকাতা, নদীয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলেও ওলাবিবি পূজিত হন। আহমদ শরীফ বলেন যে, ওলাবিবি মূলত হিন্দু দেবতারই প্রতিরূপ। তাঁর মতে, ওলাদেবী থেকে ওলাবিবি হয়েছে। শাসক-শাসিতের তথা হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলন, সদ্ভাব ও প্রীতির ভিত্তিতে এসব লৌকিক তথা কাল্পনিক পীর সৃষ্ট। জীবন ও জীবিকার এবং পীড়ন ও নিরাপত্তার অভিন্নতাবোধ থেকেই এই প্রীতি ও মিলনের জন্ম।

যিনি 'ওলাবিবি' তিনিই 'ওলাইচন্ডী' নামে অভিহিত। ওলাবিবি মুসলিম সংস্করণ এবং ওলাইচন্ডী হিন্দু সংস্করণ মাত্র। গ্রামের সাধারণ ভক্তগণ বিবিমা নামে ডাকেন। ওলাবিবি নামটির চল বেশী। তাকে ওলাওঠা বিবি বলা যায়, কিন্তু এ নামে কেউ ডাকেন না। ওলা অর্থে নামা আর ওঠা অর্থে উগরে ফেলা বা বমন করা। ওলাবিবি তাই কলেরার অধিষ্ঠাত্রীকে বোঝায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মথুরাপুর থানার কাশীনগর গ্রামে আদিগঙ্গার (যা এখন মজে গেছে) দ্বারিক রাস্তার পাশে একটি পুরাতন অশ্বত্থ গাছের তলায় একটি মন্দির আছে। স্থানীয় লোকে বলেন 'মাইবিবির থান'। 'থান' 'স্থান' শব্দের অপভ্রংশ। যে স্থানে বিবির ঘট স্থাপন করা হয়েছিল তা ৩০।৪০ বছর আগে পর্যন্ত টিনের চাল দেওয়া মাটির ঘর ছিল। ঘরটি স্থাপন করেছিলেন স্থানীয় 'বাগ' পরিবারের লোক। পরে ব্যবসায়ীরা ইটের দেওয়াল করেন ও জয়নগর তিলিপাড়ার এক ব্যবসায়ী উপরের গম্বুজ তৈরি করে দেন।

পূর্বে মাইবিবির প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার 'ভর' হত বা জাঁকজমক করে পুজো দেওয়া হত। এখনো হয়। আব সেই থেকেই এখানে সোমবার ও বৃহস্পতিবার এই দুদিন 'হাট' বসে থাকে।

এখানে মন্দিরে প্রথম থেকে খাড়ি গ্রামের এক ফকির পরিবার সেবায়েত নিযুক্ত আছেন। ওঁরা আগে কাশীনগরের কাছারি বাড়ির কাছাকাছি থাকতেন। বর্তমানে যিনি পূজারী আছেন তাঁর নাম রহমান ফকির। ওঁর বাবারা চার ভাই। দুই ভাই সমেত এখন মোট ছ'টি শেয়ার আছে এই থানে। থানের আয় ভাল। হাটবারে ১০।১৫ টাকার মত দক্ষিণা হয় ও পৌষ মাসে হয় ২৫।৩০ টাকার মত। আবার পৌষ মাসে 'বিল মাগুন' বা 'ন-মাগুনে'র সময় ৭০।৮০ টাকার মত দক্ষিণা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সময় হাজত ও মানত আদায়ের সময় কাপড়, অর্থ ইত্যাদি দান পাওয়া যায়।

এই থান বা দেবতার নামে কোনো জমি নেই। এক সাক্ষাৎকারে রহমান সাহেব জানালেন, এক সময় জমি ছিল, বিঘা ৫-এর মত নিষ্কর জমি পাওয়া গেছিল; বাবার কাছে শোনা, স্থানীয় এক সুদখোর ডাক্তার কয়েক পালি ধানের বিনিময়ে সে জমিটি হস্তগত করেন, ফলে এখন আর কোন জমি নেই।

এখানে ওলাবিবির বেশ কয়েকটি 'ছলন' আছে। 'ছলন' অর্থে মূর্তি। মূল মূর্তিটির গায়ের রঙ ঘন হলুদ, চোখ দুটি টানাটানা, নাক, ঠোঁট বেশ

সুন্দর, হাত দুটি প্রসারিত (মুদ্রার স্থিরতা নেই)। কোন কোনটি কোলে শিশু সন্তানসহ সিংহাসনে উপবিষ্ট, একটি পা অপর পায়ের হাঁটুতে তুলে মোড়া, অন্য পাটি ঝুলছে। সারা দেহে গয়না, মুকুট। কোন কোনটি এলোকেশী। সাধারণত নীল শাড়ি পরা।

কোন কোন মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে এই মূর্তিটিতে খানদানী মুসলমান কিশোরীর মত পিরান, পাজামা, টুপি, ওড়না পরানো থাকে।

ওলাবিবি কিন্তু গৃহদেবী নন। সাধারণত পল্লীর কোন নির্জন স্থানে, কোন গাছের তলায় এর থান দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও মাটির ঢিপি, মাটির তৈরি বা ইটের তৈরি অনুচ্চ আসনটিকে থান হিসাবে করে নেওয়া হয়েছে। কেউ মূর্তি স্থাপন করে পুজো দেয়, আবার কেউবা মন্দিরে স্থায়ী মূর্তির সামনে হাজত-মানত-শিরনি দিয়ে থাকেন।

গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব হলে গ্রামবাসীরা বিশেষভাবে ওলাবিবি পুজোর ব্যবস্থা করে থাকেন। কলেরার প্রাদুর্ভাবকে গ্রাম্য ভাষায় 'গ্রাম গরম হওয়া' বলে। কিছু গায়েন বা জাগরণী দল আছেন যাঁরা ওলাবিবি মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গান গেয়ে থাকেন। ওলাবিবির পুজোয় আতপ চাল, পাটালি, পান-সুপারি, বাতাসা প্রভৃতি নৈবেদ্যরূপে এবং ফুল, ফল, দুধ, চাল, পয়সা প্রভৃতি ভক্তিঅর্ঘ্যরূপে প্রদত্ত হতে দেখা যায়। ধূপবাতি আনুষঙ্গিক হিসাবে অনেকে দিয়ে থাকেন। খাসী, মুরগী ইত্যাদি রন্ধন করে নৈবেদ্য সাজানো যায়।

বহুবার দেখা গেছে, কলেরা-হাম-বসন্তের সময় গ্রামের বা বাজারের মোড়ল-মাতব্বর গোছের লোকজন মিলিতভাবে চাঁদা তুলে বিবিমার 'জাগরণ' সহ পুজো দিয়ে থাকেন।

ওলাবিবির থানে নিত্য পুজো দেওয়া যায়। নিত্য পুজোয় আড়ম্বর নেই। ভক্ত নিজে অর্ঘ্য সাজিয়ে পুজো দিতে পারেন। বিবিমার সমস্ত থানেই পুরোহিত ব্রাহ্মণেতর জাতি।

রোগমুক্তির কামনায় বা বিশেষ মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়ার আশায় ভক্তগণ ওলাবিবির মন্দিরের জানালায় ইটের টুকরো বেঁধে দেন এবং মনস্কামনা সিদ্ধ হলে বিশেষ পুজো দিয়ে থাকেন। অনেকে মাসে মাসে ক্ষুদ্রাকৃতি বিবিমার ছলন, ঘোড়া বা হাতির মূর্তি থানের বাইরে স্থাপন করে দিয়ে যান, বেশী জমে গেলে সেবায়েত সেগুলিকে জলে বিসর্জন দিয়ে দেন।

ওলাবিবি বহু স্থানের মত কাশীনগরেও একক থাকেন না। তাঁর সঙ্গে অন্যান্য ছয় ভগিনী আছেন। তাঁদের সাত বোনের নাম যথাক্রমে ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, চাঁদবিবি, আসানবিবি, বাহড়বিবি, আজগৈবিবি ও ঝেটুনেবিবি। কোন কোন গবেষকের মত, এই সাত বিবি সম্ভবত শাস্ত্রীয় মতে পূজিতা সপ্তমাতৃকা—ব্রাহ্মী, মহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বরাহী, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি। কিন্তু সপ্ত মাতৃকার সঙ্গে এই সাত বিবির কোন সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। বাঁকুড়া, বীরভূম অঞ্চলে আষাঢ় সাত বউনী বা সাত বনদেবী চমকিনী, সাতকিনী, বঙ্গিনী প্রভৃতি, জঙ্গল মহলের জামবালা দেবীর সাত ভগিনী যথাক্রমে বিলাসিনী, কাজিজাম, বাশুলি, চণ্ডী প্রভৃতির সঙ্গে ওলাবিবির সাত বোনের আকৃতি ও পূজা পদ্ধতিতে সাদৃশ্য দেখা যায়। বিনয় ঘোষ উল্লেখ করেছেন, 'মুসলমান আমলে সাতবিবি নামে এই বনদেবীগণ অভিহিত হন। এদের প্রধান ওলাবিবিই পূজা পান আর ছয় বোন তার ভাগ পান। অবশ্য সকল বোনের মর্যাদা সমান।'
দক্ষিণ ভারতের গ্রাম্য দেবী সপ্তকানিংগেম এবং মীনাক্ষী ও তাঁর ছয় ভগ্নীর সঙ্গে কয়েকটি দিক থেকে উক্ত সাত বিবির মিল দেখা যায়। কারও মতে সপ্তমাতৃকা পরবর্তীকালে সাত বউনী ও মুসলমান আমলে সাতবিবি হয়েছেন: সাতবিবির পূজা প্রথা প্রাগৈতিহাসিক যুগেও প্রচলিত ছিল। মহেঞ্জোদাড়ো থেকে প্রাপ্ত মৃন্ময় ফলকে দণ্ডায়মান সাতটি নারী মূর্তিকে আর্নেস্ট ম্যাকে শীতলা ও তাঁর ছয় ভগিনীর দেবীমূর্তি বলে মনে করেন।

তবে ওলাবিবি যে রোগ-শোক, বিশেষ করে কলেরার দেবী তা সকল থানগুলি ঘুরলে ভক্তদের ও সেবায়েতদের প্রশ্ন করলে জানা যায়। সুন্দরলাল হোড়-এর বক্তব্য, 'Ola and Jhola are beleived to be two sisters, the former presides over the disease of cholera and the latter that of small pox'. অর্থাৎ ওলা ও ঝোলা দুই বোন বলে পরিচিত, যাঁবা কলেরা ও বসন্তের সংহারক দেবী।

কাশীনগরের আশেপাশে এ জাতীয় বিখ্যাত থান তেমন দেখা যায় না। এখানে ১৫।২০ মাইল দূর থেকে লোক পূজো দিতে আসেন। তবে মগরাহাট থানার 'আলিদা' গ্রামে একটি থান আছে যেখানে চৈত্র মাসে ২৪-২৬ এই তিন দিন বেশ বড় মেলা বসে ও বিবিমাদের বিশেষ আরাধনা করা হয়ে থাকে।

মনে রাখতে হবে, বনবিবি বা বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কিন্তু আলাদা। বনে মধু, কাঠ, মাছ বা শিকার অন্বেষণে যাবার আগে বনদেবীকে পুজো দেবার রীতি আছে। কিন্তু অনেকে মাইবিবিকেও পুজো দিয়ে থাকেন। স্থানীয় ছোট বড় সকল ব্যবসায়ীর ধারণা, বিক্রি বৃদ্ধির জন্য মাইবিবিকে পুজো দেওয়া উচিত। তাদের একমাত্র কামনা 'বিক্রি হওয়া' ও 'বিক্রি বৃদ্ধি করা', তাই হাটবার করে তাদের বেশী বেশী করে পুজো দিতে দেখা যায়। অনেক সময় যাত্রা-সিনেমা-সার্কাসের ব্যবসায়িক সাফল্যের কামনায় ও মামলা মোকদ্দমায় জয়লাভের আশায় কিংবা 'ভোট' ইত্যাদিতে জয়লাভের জন্য ব্যাকুলভাবে পুজো দিতে দেখা যায়। আশেপাশের অধিবাসীদের নব বিবাহিত দম্পতিকে এই থানে বিবিমায়ের নিকট 'গড়' করানো হয়।

এভাবে বহু শত বছর ধরে সাধারণ গ্রাম্য মানুষের মনের মণিকোঠায় দেবদেবী পীর পীরানীদের জন্য যে আসন পাতা হয়ে রয়েছে, অর্ঘ্য আদায় করছে, তা কি কেবলই নিস্পৃহ বিচারবোধের ফলে ? নাকি মানুষের সামন্ত নিগড়, সামন্ত-শোষণের হাত থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা ?

চোখের জলে আজ যে কাল্পনিক পীর-কন্যার কাছে মানুষ মনের বাসনা-কামনাকে জানাতে যায়, দুদিন পরে, যখন তারা জানতে পারবেন, 'শক্তি' আর 'উৎসাহ' পাবার আশায় যাঁকে তারা দেবতা বলে জানেন, তিনি আসলে মাটির ঢ্যালা, তখন ? মানুষ তো একদিন জানবেই যে, দেবতা নয়, মানুষই শক্তির উৎস !

আলোচ্য অংশে 'পীর' বা 'সুফী' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে এবং কাল্পনিক পীর পীরানী ছাড়া ইতিহাসে উল্লিখিত বাস্তবে তারা কারা ছিলেন, তা বুঝতে গেলে ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে বিষয়টি কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হওয়া দরকার।

১২২৫ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদ ধ্বংসের পর ভারতে 'সুফী'রা অবাধগতিতে বিভিন্ন ধারায় আসতে আরম্ভ করেন। এর আগেও এদেশে তাদের প্রভাব ছিল তবে তা উল্লেখযোগ্য নয়। যদিও খ্রীস্টীয় একাদশ শতকে ভারতে 'সুফী' প্রভাবের যুগ বলা হয়ে থাকে। পূর্বে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আদম পীর, শাহ সুলতান রুমী, খাজা মুইনুদ্দীন চিশতি, মখদুম শেখ, জালালুদ্দিন তবরেজী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। পরে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে গোরাচাঁদ, পাঁচপীর, ফতেমাবিবি, বদরপীর, বড় খাঁ গাজি, তিতুমীর, মাদার পীর, লালন শাহ, হাসান পীর প্রমুখদের বহু কাহিনীতে কাব্যের মুখ্য ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায়।

পীর শব্দের অর্থ বৃদ্ধ বা প্রাচীন, ভাবার্থ 'গুরু'। বৌদ্ধ শ্রমণদের বলা হত 'থের', সংস্কৃত 'স্থবির' শব্দের অর্থ বৃদ্ধ বা জ্ঞানী পুরুষ। 'পীর' ফারসী শব্দ। পীরগণ ছিলেন ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারক। 'সুফী' শব্দটি আরবী শব্দ 'তসাউওফ' বা 'সুফ্' শব্দ থেকে এসেছে। তসাউওফ্ শব্দের অর্থ 'পরিত্রাতা'। 'সুফ্, শব্দের অর্থ পশম। যাঁরা পশমী বস্ত্র ধারণ করেন, পবিত্র পথে চলেন তাঁদের সুফী বলা হত। কেউ কেউ বলেন আহল-উস্-সফ্ফা অর্থাৎ হজরত মহম্মদ-এর সময় যাঁরা মস্‌জিদের মেঝেতে বসে সাধনা করতেন তাঁদের থেকেই 'সুফী' কথাটি এসেছে।

মধ্যযুগে ভারতবর্ষের বণিকরা আরব বণিকদের সংগে বাণিজ্য করতেন। সুফীগণ এদেশে আরব বণিকদের সংগে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রথম আসেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়।

খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকে কুমারিল ভট্ট ও শংকরাচার্য হিন্দু ধর্মকে তাঁদের নিজস্ব সংস্কার ও ব্যষ্টিচিন্তার মধ্যে এবং একটি বিশেষ শ্রেণীর চর্চার জন্য সীমিত করে দিয়েছিলেন। বেশ কিছু স্থানকে ব্রাহ্মণ বর্জিত স্থান, 'ব্রাত্যদের দেশ' বা বৌদ্ধ-প্রধান দেশ বলে চিহ্নিত করে ঘৃণায় তার ছায়া মাড়াতেন না। ঠিক সেই সমস্ত স্থানে প্রবেশ করলেন পীর-পীরানা ও সুফীরা। সেই ব্রাত্যদের দেশ হয়ে গেল মুসলমান প্রধান অঞ্চল। 'ব্রাত্য' শব্দের অর্থ নীচ বা হীন।

এদেশের মুসলমানরা প্রধানত হিন্দুদের বংশধর। তাঁদের পূর্বপুরুষরা এককালে হিন্দু ছিলেন, তাই মুসলমানদের মধ্যে আজও হিন্দু আচরণ বিধি লক্ষ্য করা যায়। তারা জ্ঞাতসারে করেন না, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভাব রূপান্তরিত হয়ে তাদের ধর্মীয় চেতনার মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে। পীররা ইস্‌লামের বাণী প্রচার করতে এসে বহু স্থানে বৌদ্ধদের দ্বারা প্রভাবিত বা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত ধর্মীয় সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছিলেন। বহু বড় বড় যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছিল। এমনি একটি যুদ্ধ ঘটে বল্লাল সেনের সংগে। ঘটনাটি গোপাল ভট্ট রচিত 'বল্লাল চরিত'-এ উল্লিখিত ১১৭৮ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা। বল্লাল সেন 'গো-কোরবানী' নিষেধাজ্ঞা করলে জনৈক হজ যাত্রী মুসলমান মক্কা গিয়ে পীর আদমকে সব ঘটনা জানায়, পীর আদম সদলবলে ঢাকা জেলার বামপাল নামক স্থানে আবদুল্লাপুর গ্রামে ইস্‌লাম ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। বল্লাল সেন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও তাঁকে মেরে ফেলেন। আদম

'শহীদ' হন। ধর্ম প্রচারের জন্য পীর আদমই বঙ্গের প্রথম 'গাজী' হন। 'গাজী' শব্দের অর্থ শহীদ।

এরূপ শত শত যুদ্ধ ও লড়াই হয়। হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবের মধ্যে ঢুকে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল পীরদের। পীররা তাই একটি মিশ্র ব্যবহার-রীতি প্রচার করতে থাকেন। হিন্দু মুসলমানের মিশ্র সংস্কৃতি হল পীর সংস্কৃতি। আমাদের দেশে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের প্রচারের পাশাপাশি পীর-সাহিত্যও প্রচারিত হতে থাকল। পীর-পীরানীদের প্রভাব ভাগীরথী নদীর দক্ষিণ প্রান্তের পূর্ব অঞ্চলে যেমন পড়েছিল তেমন আর কোথাও পড়েনি। চব্বিশ পরগনা জেলার পূর্ব ভাগে এর প্রভাব সুস্পষ্ট।

পীর সংস্কৃতি এদেশে পাকাপোক্তভাবে স্থায়ী হবার একটি কারণও আছে। চিশতিয়া ও সুহরাবর্দীয়া তরীকার সুফীগণও অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা প্রাথমিক যুগে ভারতবর্ষে আগমন করেন। হিন্দু অদ্বৈতবাদের সঙ্গে উক্ত তরীকাদ্বয়ের সুফী সাধকগণের মতাদর্শের সাদৃশ্য থাকার ফলে তাঁদের মতবাদ এদেশে স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছিল। পীরগণ প্রভাবিত হিন্দু-মুসলিম নরনারীর মধ্যে এক সমন্বয় ভাব গড়ে ওঠে।

একটা কথা মনে রাখা উচিত। পীর-পীরানীরা এদেশে ধর্মের প্রচারক হিসাবে ঢুকেছিলেন। সঙ্গে ঢুকেছিল 'যুদ্ধ', ধর্মের জন্য যুদ্ধ। যুদ্ধ মানে মড়ক আর জীবনহানি। এইসব যুদ্ধের পিছনে হাত ও শক্তি ছিল রাজা বাদশাদের। তাদের স্বার্থ ধর্ম রক্ষা করা, ধর্ম প্রচার করা। ধর্মের ধোঁয়া দিয়ে প্রজাদের নির্জীব করে রাখা যাতে কেউ বিদ্রোহ করতে না পারে। কোন রাজা অন্য দেশ আক্রমণ করার সময় প্রথম বস্তুসামগ্রী নিয়ে ঢুকত, বাজার দখল করত, পণ্য বেচাকেনা করত। সেই সঙ্গে ক্রেতা-বিক্রেতার মানসিক চিন্তা, যুক্তি, ধ্যান-ধারণাকেও বশ করার জন্য ধর্মীয় তত্ত্ব প্রচারক আমদানি করত। ধর্মের পিছনে আসত রাষ্ট্রশক্তি। এভাবে পররাজ্য গ্রাস করত।

অন্যদেশের 'ধর্মভীরু' (?) শাসকও তা বুঝত। এবং বুঝত বলেই ধর্ম প্রচারকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিত। পীর ধর্ম প্রচারকরা শ্রেণী ভিত্তিক (সামন্ত প্রভুদের স্বার্থে) বাণী প্রচারে ভুল করত না। যেমন—রাজতন্ত্র চিরস্থায়ী ; গরিবের দুঃখ চিরস্থায়ী ; রাজার জন্য সমস্ত ভাগই 'পুণ্য'—এরূপ প্রচার করত। প্রত্যেকটি যুগে শাসকগোষ্ঠী শাসন ও শোষণ বজায় রাখতে ধর্মীয়

প্রচারকবৃন্দ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় আচরণবিধি ইত্যাদিকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। আজও করছে।

আমাদের এখানে ধর্মীয় লড়াইয়ে মারা গেছেন এমন একজন 'সুফী' ছিলেন বড়খাঁ গাজী। কাশীনগরের পাশে খাড়ি গ্রামে বড়খাঁ গাজীর সমাধি আছে। চব্বিশ পরগনা জেলায় এটি প্রথম 'শহীদ' সমাধি বলে অনেকে মনে করেন। পীর নেতা বড়খাঁ ধর্মযুদ্ধে খাড়ি গ্রামেই নিহত হন। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা, ৩য় খণ্ড, ১৯৫৮, পুস্তক থেকে এর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিবরণটি তুলে দিলাম।

'খাড়ি গ্রামে একটি প্রাচীন বৃহৎ পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব পারে বড়খাঁ গাজীর আস্তানাটি অবস্থিত। পুষ্করিণীর উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম পারে বাঁধানো প্রশস্ত ঘাট আছে। ইষ্টক-নির্মিত আস্তানা ঘরটি দক্ষিণমুখী, সম্মুখে বারান্দাযুক্ত ও উপরে গম্বুজ বিশিষ্ট। সংস্কার অভাবে ঘরটি জীর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই ঘরের মধ্যে মাথায় পাগড়ী বাঁধা, মুখে চাপদাড়ি, পায়ে জুতো এবং দক্ষিণ হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া যোদ্ধাবেশী অশ্বারোহী বড়খাঁ গাজী সাহেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটি মনুষ্য প্রমাণ হইবে।...বড়খাঁ গাজীর নিয়মিত পূজা হয় না। ভক্তরা যে যখন আসেন তখনই পূজার আয়োজন করা হয়। সুন্দরবনে যাঁহারা কাঠ কাটিতে অথবা মধু সংগ্রহ করিতে যান তাহারা প্রায় প্রত্যেকেই বড়খাঁ গাজীর আস্তানায় হাজত পূজা দিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন প্রতি বৎসর নন্দা স্নান উপলক্ষে যে সকল যাত্রী চক্রতীর্থে আসেন তাহারা খাড়িতে স্নান সারিয়া গাজীর উদ্দেশে পূজা দিয়া যান।'

এমনিতর গাজী, পীর-পীরানী ও বিবিদের বহু ইতিহাস ছড়িয়ে আছে নিম্নবঙ্গের, বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রাম গ্রামান্তরে, লোককাব্যে, উপকথায়, গল্পকথায় ও কিংবদন্তিতে।

বনদেবতার বিকাশ

দুলাল চৌধুরী

পশ্চিম সুন্দরবনের ৬৩০ বর্গমাইল এলাকা অরণ্যাবৃত। সুন্দরবন নানা-রকম গাছ-গাছালির আশ্রয়স্থল। সুঁদরী গাছ (অনেকের ধারণা এই 'সুন্দরী' গাছের জন্যই এখানকার নাম হয়েছে সুন্দরবন) সাধারণত ৭০ ফুট লম্বা হয়। শক্ত খুঁটি হিসেবে এর ব্যবহার। এছাড়া কাঁকরা, গেওয়া, পাসুর, গরান, ধুন্দল, বাইন, কেওড়া এবং গোলপাতা প্রভৃতি এখানকার শোভাই শুধু বর্ধন করে না, এদের ছালের রসে ট্যানিন থাকায় চামড়া রাঙানোর জন্য বিশেষ ধরনের পদার্থ পাওয়া যায়। খলসী ও সিংড়াফুলের মধু স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। তবে বেশী মধু সংগৃহীত হয় গরান গাছের ফুল থেকেই। বছরে প্রায় ছ হাজার মণ মধু এবং প্রচুর পরিমাণ মোম এখান থেকে সংগৃহীত হয়।

সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে বলে শোনা যায়। এমন জমাটি বনে পশু, পাখি, সাপ এবং সমুদ্রমুখের নদী নালায় কুমিরের অভাব থাকার কথা নয়; সুন্দরবনে সে অভাব নেইও। সুন্দরবনের খাঁড়ি-নদী-নালায় কুমিরের সংখ্যা প্রচুর। একমাত্র উত্তর কানাডা ছাড়া এরূপ ভীষণ প্রকৃতির কুমির পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে চিতল হরিণদের সঙ্গে বানরদের বড় বন্ধুত্ব। উঁচু গাছ থেকে পাতা ফেলে বাঘের আগমন ঘোষণা করে বানর আর শান্ত চিতল হরিণের দল সরে যায় নিরাপদ দূরত্বে। বর্তমানে সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্যে প্রাণী বধ সরকার আইন করে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এই অভয়ারণ্যগুলি হলো লোথিয়া দ্বীপ, হ্যালিডে দ্বীপ এবং সজনেখালি। এই দ্বীপগুলির আয়তন যথাক্রমে ১৪'৬৭, ২'৩ এবং ১৩৯'৯২ বর্গমাইল। সজনে-

খালিতে শীতকালে পাখির মেলা বসে যায়। দেশ-বিদেশের রং-বেরংয়ের পাখি এসে জায়গাটিকে মনোরম করে তোলে, সৌন্দর্য বেড়ে যায় সুন্দরবনের।

এই বন-পটভূমিতেই পূজিতা হন 'বনবিবি'—বনের দেবী, সুন্দরবনের জাগ্রত অরণ্যদেবী। এঁর বহু নাম—বিবিমা, বনদুর্গা, বনচণ্ডী, বনষষ্ঠী ইত্যাদি। প্রাচীন রোমের এক পশু-দেবীর নাম 'Bona Dea'. 'বনবিবি'—তিনি মুসলমান অধিকারের পরে হয়েছন। তাঁর ক্রোড়ে শায়িত শিশু চিরন্তন মাতৃমূর্তির কথাই ঘোষণা করে। আইসিস-এর ক্রোড়ে হোরাস, মেরীর ক্রোড়ে যীশু, দুর্গার ক্রোড়ে গণেশ, যশোদার ক্রোড়ে কৃষ্ণ—এরা এবং 'বনবিবি' এক ও অভিন্ন। (রেখা ও লেখা / ১৩৭৫ 'বনদুর্গা' ও 'বনবিবি')। উভয়েই এক ভাবানুষঙ্গের ফলশ্রুতি। চব্বিশ পরগনার সংস্কৃতিতে ইতিহাসের চক্রপথে এক অসাধারণ ধর্মসমন্বয় ঘটেছে সপ্তদশ শতাব্দীতে। সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, কালু রায়, দক্ষিণ রায়, বনবিবি সে কথাই প্রমাণ করে। এঁদের নিয়ে রচিত পাঁচালি ও কাব্যগুলিও তাই মিশ্রভাষারীতির এবং মিশ্র সংস্কৃতির রেণুস্নাত।

চব্বিশ পরগনা জেলার ভাগীরথীর শাখা জলঙ্গী, ইছামতী, মাথাভাঙ্গা, হুগলী, বিদ্যাধরী, পিয়ালী, মাতলা, কালিন্দী, ঠাকুরাণ, কইকালমারা প্রভৃতি নদী জন-জীবন ও ভূপ্রকৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। পললময় উর্বর মৃত্তিকার জন্য চব্বিশ পরগনার অনেক অঞ্চল ঘন বনবিশিষ্ট। নিবিড় অরণ্যানীর জন্য এই জেলায় "বনদেবতার" প্রাচুর্যও পরিলক্ষিত হয়। বনদেবতার মধ্যে দক্ষিণ রায়, বারাঠাকুর বনবিবি, সাতবিবি, আটেশ্বর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বনদেবতারা জেলে, মালো, কাঠুরেদের উপাস্য।

চব্বিশ পরগনা জেলায় এমন কতকগুলি লৌকিক দেবীর সমাবেশ ঘটেছে, যা অন্যত্র দুর্লভ। এই দেব-দেবীর থানে হিন্দু ও মুসলমান অনাবিলভাবে মানত করে, শিরনি দেয়। এই বনদেবীর মধ্যে শীতলা (কলেরা-বসন্তের প্রতিরোধক দেবী), মনসা (সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী), দক্ষিণ রায় বা দক্ষিণ শ্বার 'বনদেবতা', সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ (মঙ্গলের দেবতা), মানিকপীর (গবাদি পশুরক্ষক দেবতা), ওলাবিবি (কলেরার দেবতা), বনবিবি (বনের দেবী) ইত্যাদি। দক্ষিণ রায়কে কেউ কেউ বাঘের দেবতা বলে মনে করেন। দক্ষিণ রায়ের কাহিনী উপজীব্য করে বাংলা ভাষায় বেশ ক'খানা 'রায়মঙ্গল কাব্য' ও পাঁচালি প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' উল্লেখযোগ্য। কবি

কৃষ্ণরাম দাস ১৬৮৬-৮৭ খ্রীঃ 'রায়মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। সুন্দরবনাঞ্চলে দক্ষিণ রায় ও বড় খাঁ গাজীর মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হবার পর কোরান-পুরাণ হাতে শ্রীকৃষ্ণ পয়গম্বর মূর্তি ঈশ্বর বেশে এসে তাঁদের রাজ্যসীমা নির্দেশ করে দিলেন। এটাই মূল কাহিনী। কবি হরিদেবের 'রায়মঙ্গল' প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। বাউলে, মাউলে, মালঙ্গি, ধীবররাই সাড়ম্বরে দক্ষিণ রায়, কালু রায়, বনবিবি, গাজীসাহেব ও পীরের পূজানুষ্ঠান করে। দক্ষিণবঙ্গের পূজারীদের একটি মন্ত্রে দক্ষিণ রায়কে বলা হয়েছে ঃ

চন্দ্র বদন চন্দ্রকায়।
শাদুর্ল বাহন দক্ষিণ রায়॥

কিংবা

সাগর সঙ্গম সুন্দর কায়।
ঘোটক বাহন দক্ষিণ রায়॥

—দক্ষিণ রায়—দক্ষিণ-দর, দক্ষিণদ্বার, দক্ষিণেশ্বর, বারাঠাকুর (মুণ্ডমূর্তি) নামেও পরিচিত এবং 'রায়' বিষয়ক অনেক লোক-কাহিনীর তিনি নায়ক। অনেকে একে বাঘের দেবতা বলেছেন। মূলত ইনি ব্যাঘ্রবাহিত দেবতা। বাঘ তাঁর বাহন। দক্ষিণ রায়ের উৎস রহস্যময় বলে অনেক গবেষক মনে করেন। আদিম ও আর্যেতর মানবের ব্রাত্য দেবতা দক্ষিণ রায়। দক্ষিণ রায় বনদেবতা আবার তিনি 'দক্ষিণ-দ্বারপাল'। সম্ভবত উভয় ভাবানুষঙ্গে তিনি দক্ষিণের শ্রেষ্ঠ লৌকিক দেবতা। বনচারী ও সমুদ্রগামীর রক্ষক ক্ষেত্রপাল দেবতা। দক্ষিণ-রায়কে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে অসংখ্য গান ও কাব্য। দক্ষিণ রায় নিজে পরিচয় দিচ্ছেন ঃ

আমিত জংগল রাজা দক্ষিণ ঈশ্বর।
(আমার) সেবক বটে হয়েত ধীবর॥

মৎস্যজীবীরা তাদের জলযাত্রার পূর্বে দক্ষিণ রায়ের পূজা করেন, মানত দেন, বর মাগেন, কল্যাণ প্রার্থনা করেন। সুতরাং একথা অনুমান করতে বাধা নেই, দক্ষিণ রায় সাগরগামী মানুষের কল্যাণের দেবতা। অধিকন্তু "জাতীয় বীর" হিসেবেও দক্ষিণ রায় কিংবদন্তির নায়ক হতে পারেন। পরবর্তী কালে দেবায়িত হয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা বিরল নয়। দক্ষিণদ্বার রক্ষক—দক্ষিণ রায় প্রজারঞ্জক সামন্ত প্রভু (?) অথবা লোকসমাজের প্রিয় নায়ক

হিসেবে সমাজমানসে আপন আসন পাকা করে নিয়েছেন। কিন্তু বিস্তৃত অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে দক্ষিণ রায় হচ্ছেন 'দক্ষিণদুয়ার-রক্ষক দেবতা' অথবা বনের রক্ষক দেবতা। বিশেষ করে জেলে কাঠুরেরা দক্ষিণ রায়ের পুজো করেন। ধপ্‌ধপিতে দক্ষিণ রায়ের যে মন্দির আছে, সেখানে এক বিশাল পুরুষ মূর্তি দক্ষিণেশ্বর নামে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মূর্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পায়ে বুট এবং ডান হাতে বন্দুক। এমন কি তীর ধনুকও রয়েছে পাশে। চক্ষু আয়ত ও বিস্ফারিত এক ভয়াল অথচ সুন্দর মূর্তি। দূরান্তের এবং আশেপাশের গ্রামের মানুষ মানত দিতে আসেন প্রতি মঙ্গল এবং শনিবার। এখানে তিনি সর্বরোগহর দেবতায় পরিণত। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক দক্ষিণ রায়কে তাদের পরম পূজ্য লোকদেবতারূপে বরণ করে নিয়েছেন। সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে বনবিবিতে। খোর্দনহলার বনবিবি স্থানীয় ফকির দ্বারা অর্চিতা। অথচ হিন্দু-মুসলমান উভয়েই মানত দেন, হাজোত মানত করেন। বনগ্রাম—হাসনাবাদ—আঁটিসারা—বারুইপুর থেকে জয়নগর-মজিলপুর হয়ে ডায়মণ্ডহারবার-করঞ্জালি-কাটাবেনে-সাগর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের এই সুবিস্তৃত অঞ্চলে বন-দেবতার এক অপূর্ব মিছিল লক্ষ্য করা যাবে। বিবিমা, পঞ্চানন্দ, পঞ্চানন (পাঁচু), বারাঠাকুর, শীতলা, সাতবিবি, গাজীসাহেব, নারায়ণী, বিশালাক্ষী, রাখাল ঠাকুর ইত্যাদি। এঁরা সকলেই এই অঞ্চলের লৌকিক দেবতা। এঁদের প্রভাব লোকজীবনে অসামান্য। এরাই লোকসমাজের নীতি ও শান্তি নিয়ন্ত্রক।

বনবিবি

সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বনবিবির গান গাওয়া হয়ে থাকে ' নাম : 'বোন বিবির কেরামতি' অর্থাৎ বোন বিবির জহুরা নামা বা ধোনা মোলে দুখের পালা বলা হয়। এটি একটি লৌকিক পালা গান।

বনবিবি বাংলার লৌকিক দেবী। ইনি সুন্দরবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কাছে ইনি পূজিতা। তিনি গরীবের 'মা জননী,' তিনি 'জগতের মাতা'। পালাগানে বনবিবির আবির্ভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে :

আদম-জাতের পরে আল্লা নেমেবান।
আলেমল গায়ে তিনি রহিম ও রহমান ॥

বোন বিবি সাজংগলিকে ভেজে দুনিয়াতে।
হুকুম হইল যাও আঠার ভাটিতে ।।
বাদাবনে যাব মোরা হুকুম আল্লার।
সে কারণে পয়দা হইনু ঘরেতে তোমার ।।

ভাঙ্গর সাহার কাছে তাঁরা আঠার ভাটির পরিচয় নিলেন। ভাঙ্গর সাহা বললেন,

বনবিবি এবং সাজঙ্গলী দুজনে ভাই বোন। তারা বেহেস্তে ছিল। আল্লাতালার হুকুমে মক্কা শরীয়াতের বেরাহিম ফকিরের ঔরষে এবং গুলাল বিবির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। বোধহয় ফকিরের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর নাম ফুলবিবি ছিল। তিনি 'আটকুঁড়ে' ছিলেন। তাঁর সন্তান হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সন্তানের কামনায় আল্লাতালার ইচ্ছায় বেরাহিম ফকির দ্বিতীয়বার জলিল ফকিরের কন্যা গুলাল বিবিকে বিবাহ করেন।

বেরাহিম ফকির ফুলবিবির কারসাজিতে গর্ভবতী গুলাল বিবিকে বনের মধ্যে নির্বাসন দেন। গুলাল বিবির নির্জন বনবাসে বনবিবি ও সাজঙ্গলী 'একগর্ভ' থেকে 'তাওল্লাদ' হয়। মাতা গুলাল বিবি বনের মধ্যে বনবিবিকে রেখে সাজঙ্গলীকে নিয়ে অন্যত্র চলে যান। অসহায় বনবিবিকে বনের হরিণেরাই লালন পালন করতে থাকে।

পরবর্তীকালে বেরাহিম ফকিরের সঙ্গে গুলাল বিবির মিলন হয়, বনবিবির সঙ্গে সাজঙ্গলীর সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎকারের পরে মা এবং বাবাকে লক্ষ্য করে বনবিবি বলেন ঃ

নামেতে দক্ষিণ রায় ঈশ্বর ভাটির।
এ সব জঙ্গল জান তাহার জায়গীর ।।
দুসমন খাড়ি জুড়ে বহুত আছয়।
বসেছে মধুর হাট যেথায় সেথায় ।।
যাইয়া এ সব তুলে ডাল পহেলাতে।
দখল হইবে দেশ জানিবে দেলেতে ।।
চান্দখালি রায়মঙ্গল শিবদাহ আর।
প্রথমে এ সব ঠাই কর এক্তিয়ার ।।

ভাটির দেশের সকল বৃত্তান্ত জেনে নিয়ে বনবিবি এবং সাজঙ্গলী বাদাবনে

উপস্থিত হলেন। আরম্ভ হল দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বিরোধ। যুদ্ধ বেধে যাবার ঠিক প্রাক্কালে "দক্ষিণ রায়ের মাতা নারায়ণী" দক্ষিণ রায়কে যুদ্ধে না পাঠিয়ে নিজেই গেলেন। বনবিবি সাজঙ্গলীর সঙ্গে নারায়ণীর যুদ্ধ আরম্ভ হল। হাতাহাতি যুদ্ধ শেষ হলে "নারায়ণী ডরে পাও ধরিল বিবির", এবং বনবিবিকে স্বীকার করে নিয়ে বললেন "বাদাবন হইল এবে তোমার এক্তিয়ার"। নারায়ণীকে বশ্যতা স্বীকার করিয়ে বনবিবি "ভাটিশ্বরী" হলেন। ভাটিশ্বরী হয়েই তিনি ঘোষণা করলেন,

কদাচন মনে কারো দুক্ষু নাহি দিব।
সীমানা করিয়া বাদা বাটিয়া লইব।

তিনি দক্ষিণ রায়কে মোম মধুর কেন্দ্র কোদাখালি এবং অন্যান্য প্রধানদের বাদাবন ভাগ বাঁটোয়ারা করে সীমানা বেঁধে দিলেন। তাঁর মোকাম ভুরকুণ্ডুতে এবং দক্ষিণে এড়োজোল পর্যন্ত তাঁর সীমানা হল। তিনি ভবানীপুর, রাজপুর, বিয়াড়ি, মাখালগাছা, আসাড়ি, ময়নাডাঙ্গা, হাসনাবাদ, পাটলিগ্রাম, কাটাখালি প্রভৃতি স্থানে গেলেন। একে পালাগানের কাহিনীর প্রথম অংশ বলা যেতে পারে।

পালা কাহিনীর দ্বিতীয় অংশ ধোনাই, মোনাই ও দুখের কাহিনী। ধোনাই ও মোনাই দুই ভাই। বনের মোম মধু সংগ্রহ করে প্রভূত টাকা পয়সার মালিক হয়ে উঠেছে। মোম মধু সংগ্রহের জন্য তারা সপ্তডিঙা প্রস্তুত করল। কিন্তু প্রস্তুত হবার পর তাদের একজন লোক কম পড়ল। গ্রামে এক দরিদ্র বিধবা ছিল। তার দুখে নামে একমাত্র সন্তান ছিল। দুখেকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখিয়ে ধোনা তাকে নিয়ে এল। সপ্তডিঙা যাত্রা আরম্ভ করল। কিন্তু বনে গিয়ে আর মধু পায় না। বাদাবনে মোম মধু সৃজন করেন দক্ষিণ রায়। তারই হুকুমে মধু উধাও হয়ে গেছে। ধোনা নিরাশ হয়ে পড়ল। ভক্তের এই অবস্থা দেখে দক্ষিণ রায় স্বপ্নে ধোনাকে বললেন, 'নরবলি পূজা খেতে বাসনা আমার'। তিনি ধোনাকে আরও বললেন,

নরবলি পূজা যদি দিতে পার তুমি।
মোম মধু সপ্তডিঙা দিব তোরে আমি॥

ধন দৌলতের লোভে ধনবান ধোনা দুখেকেই বলি দেওয়ার ব্যবস্থা করল। বনের মধ্যে থেকে কাঠ সংগ্রহ করে এনে দুখে দেখল "ধোনা মোলে গেছে

নাও লিয়া।" ধনের লোভের কি প্রতারণা! নদীর চরে দুখেকে নিঃসঙ্গ দেখতে পেয়ে "রায়মণি" আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়ল। নরমাংস ভক্ষণের আশায় দক্ষিণরায় ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করে আনন্দে দুখেকে খাইতে যায় মনের আহ্লাদে।"

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া "দুখেকে উদ্ধার করবার জন্য বনবিবি সাজংগলীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁদের তাড়া খেয়ে দক্ষিণ রায় বড় গাজিথানের নিকট উপস্থিত হলেন।

দক্ষিণ রায়কে পিছু তাড়া করতে করতে বনবিবি ও সাজংগলী বড় গাজিথানের নিকট উপস্থিত হলেন। গাজির অনুরোধে বনবিবি দক্ষিণ রায়কে মার্জনা করলেন। দক্ষিণ রায় বনবিবির নিকট নতি স্বীকার করলে বনবিবি তাঁকেও সন্তানরূপে গ্রহণ করলেন।

বনবিবির আশীর্বাদে দক্ষিণ রায় এবং বড় গাজির সহায়তায় কুমিরের পিঠে চড়ে দুখে তার গ্রামে পেঁছায়। সেখানে গিয়ে বড় গাজিখাঁর রক্ষিত গুপ্তধন লাভ করে বহু ধনরত্নের মালিক হয়ে ওঠে। ধোনার নিজ পাপ কর্মের শাস্তি স্বরূপ তার মেয়ের সংগে দুখের বিবাহ দেয়। মা জননী বনবিবির কৃপায় দুখে বাদাবনে শান্তিতে দিন কাটায়। গরীব দুখে চৌধুরী হয়ে ওঠে।

সমগ্র পালাটির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষণীয়।—পালাটির ঘটনাস্থল আঠারভাটি বা বাদাবন। পালাতে সুন্দরবনের নাম অনুল্লিখিত। তাই মনে হয় সুন্দরবন নামাংকিত হবার পূর্বে এ পালা রচিত হয়েছিল। পালা রচিত হবার সময়ে বাদাবনের প্রধান আকর্ষণ ছিল মোম মধু এবং কাঠ। কৃষির কাজ তখন হয়তো ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়নি। দক্ষিণ রায় মোম মধু সৃজন করতেন। নরবলির দ্বারা দক্ষিণ রায়কে সন্তুষ্ট করেই মোম মধু সংগ্রহ করতে হত।

নরবলি পূজা যতক্ষণ নাহি দিবে।
মোম মধু নাহি দিব একিন জানিবে॥

দক্ষিণ রায়েরও একটি পরিচয় এ কাহিনীতে আছে, তিনি দণ্ডবক্ষ মুনির পুত্র। তাঁর মাতার নাম নারায়ণী। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজা হন, "জংগলের বিতোর রাজত্ব হইল।" ডাকিনী, যোগিনী, কালভূত, দেড় লক্ষ সোমার, সাঁইত্রিশ কোটি কুইকি, ছেপাই, লস্কর তাঁর ছিল। তাঁর অস্ত্রের মধ্যে

ছিল সটচক্র, গদাচক্র, ধর্মচক্র বাণ, শেল ইত্যাদি। আর ছিল বনের বাঘ, জলের কুমির, হাঙ্গর প্রভৃতি। দক্ষিণ রায় "অত্যাচার করে যায় মানুষ ধরিয়া," "বাদাবনে মানুষের দেখা যদি পায়। বাঘের ছুরত হইয়া পাকড়িয়া খায়॥" এই রাক্ষসের জাতকে কেউই প্রতিরোধ করতে পারছিল না।

তাই আল্লার হুকুমে সাজঙ্গলী এবং বনবিবি আঠার ভাটিতে আবির্ভূত হলেন। তাঁরা বাদাবনে উপস্থিত হলে তাঁদের রূপে "বন হয়েছে উজ্বলা।" কিন্তু দক্ষিণ রায় বলে উঠলেন:

বলে মেরা বাদাবনে নেড়ে আইল কি কারণে
যবনেরে দেহ ভাগাইয়া।
দেও দানা ভূত যারা, মেরা তাবেদার তারা
ডেকে আন যাইব লড়িতে॥

অর্থাৎ দক্ষিণ রায়ের পরবর্তী সময়ের শক্তি বনবিবি। নারায়ণী কাহিনী, দক্ষিণ রায়ের কাহিনী, বড় গাজিখাঁর কাহিনী, ধোনা, মোনা এবং দুখের কাহিনীও বনবিবি সাজঙ্গলীর কাহিনী যুক্ত হয়ে একটি পালাগান রূপে পূর্ণতা লাভ করেছে। মনে হয়, কাহিনীগুলি স্বতন্ত্রভাবে এক সময়ে ছিল। স্বতন্ত্র এবং প্রক্ষিপ্ত কাহিনীগুলি পরবর্তীকালে একত্রে গ্রথিত হয়ে বনবিবির পালায় উন্নীত হয়েছে। সমগ্র পালায় বনবিবি মাতৃরূপা, ভক্তবৎসলা, করুণাময়ী এবং দয়াবতী। তিনি কখনই উগ্র, ভয়াবহ এবং হিংস্র নন।

কাহিনীতে দুটি মৌলিক শক্তির দ্বন্দ্ব আছে। একদিকে বারজহাটির ধনবান ধোনা-মোনা, বিপরীতে বিধবার দরিদ্র সন্তান দুখে। ধনী বনাম দরিদ্রের সংঘাত এখানে আছে। লক্ষনীয় বিষয়, ধোনা মোনা দক্ষিণ রায়ের ভক্ত কিন্তু দুখে ভক্ত বনবিবির। ধনবান ধোনা মৌলে দক্ষিণ রায়কে নরবলি পূজা দিয়ে তার হুকুমে সাত ডিঙ্গা মোম মধু সংগ্রহ করে দেশে ফিরল। কিন্তু বাঘরূপী দক্ষিণ রায়ের গ্রাস থেকে বনবিবি দুখেকেই রক্ষা করলেন। শুধু দুখেকেই রক্ষা করলেন না, প্রতারক ধোনাকেও শাস্তি দিলেন, তাঁরই হুকুমে ধোনা দুখেকে তার কন্যার স্বামীরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হল।

কাহিনীর মধ্যে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বড়গাজিখাঁর বিরোধের কোন চিত্র নেই। পরন্তু বনবিবি এবং সাজঙ্গলীর তাড়া খেয়ে দক্ষিণ রায় "ভাঙ্গরে পেঁছিল গিয়া নজদিগে গাজির।" গাজিও বলেন, "নামেতে দক্ষিণ রায় বন্ধু যে আমার।"

কাহিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতাও নন কিংবা কৃষির দেবতাও নন, তিনি "মোম মধু সৃজন-কারী" নরখাদক, ধোনা-মোনা নামক ধনবান মৌলেদের দেবতা, এবং বনবিবি ধনবানদের ধন উপার্জনের সহায়ক দরিদ্র দুখেদের দেবী। তাই

কহে বিধি এক বেটা দুখে ছিল মোর।
তাহার দঃখেতে আমি আছিনু কাতর॥

কারণ, "দুখে বেটা গরীব লাছার॥"

বনবিবি সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে,'বনদুর্গা, বনচন্ডী বনষষ্ঠী বা বিশালাক্ষী কালক্রমে মুসলমান প্রাধান্যকালে বনবিবি হয়েছেন,' মতান্তরে বনবিবি 'হিন্দু-মুসলমানের লৌকিক ধর্ম চিন্তার সমন্বিত বা মিশ্রিত অরণ্য দেবী,' আবাব কেউ কেউ বলেন, বনবিবি 'আদি পাঠান যুগের কোন মুসলমান সাধিকা ও ইসলাম ধর্ম প্রচারিকা অভিজাত মহিলা ছিলেন।' শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের মতে, 'বনবিবি যে আদিতে বনদেবী তা বর্তমানের মূর্তি ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে ধরা পড়ে। এখনও এর আকৃতিতে ও বেশভূষায় অরণ্য বৈশিষ্ট্য একেবারে লোপ পায়নি।' (বাংলার লৌকিক দেবতা-পৃঃ ১০)। এর মূর্তি "অতি সুশ্রী, পৌরাণিক দেবীদের মতোই লাবণ্যময়ী," বালক সন্তানকে কোলে নিয়েও বনবিবির মূর্তি দেখা যায়।

সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে বনবিবি পূজা এখনও অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত খাড়ী (মৌজা—৪৯) গ্রামটি একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম হিসেবে খ্যাত ছিল। এটা বর্তমানে মথুরাপুর থানার অধীনে একটি সামান্য পল্লীরূপে চিহ্নিত। অথচ 'প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে খ্রীস্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে রচিত ডাকর্ণব নামক একখানি পুঁথিতে বৌদ্ধতান্ত্রিকদের চৌষট্টিটি পীঠস্থানের মধ্যে একটি পীঠস্থানরূপে উহার নাম দেখা যায়। এছাড়া মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনেও উল্লেখ আছে।'

খ.

ভারতবর্ষে গ্রাম্য দেবতা গ্রামের সংহতির মৌল শক্তি। গ্রাম্য দেবতা গ্রামজীবনের ভাবময় প্রতীক। ভারতবর্ষে একদা যেমন পরাক্রান্ত বৈদেশিক আক্রমণকারীর মিছিল এসেছিল, তেমনি লোকচক্ষুর অন্তরালে গ্রামে গাঁথা ভারতের মানসপথে

মিছিল করেছে অসংখ্য গ্রাম দেবতা। ভারতে দেবতাহীন গ্রাম নেই আবার গ্রাম-হীন দেবতা নেই। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-ইসলাম-খ্রীস্টান্ প্রভৃতি বহু ধর্মের বহু বার্তা মতবাদ ভারতের জনগণমানসে তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে কিন্তু গ্রামীণ সংহত লোকায়ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই দেউল থান আজও অক্ষয় বটের মতো অধিষ্ঠিত। বনদেবসমাজের আরও কয়েকটি দেবতার পরিচিতি এখানে দেওয়া হলো :

১ রংকিনী

মূর্তি : বিগ্রহ বিরল। সাধারণত মাটির হাতি ঘোড়া প্রতীক পূজা হয়। কোথাও কোথাও মুন্ডমূর্তি পূজা হয়। প্রস্তর প্রতীকেও পূজা হয়। ঘাটশিলায় রংকিনীর বিগ্রহটি একটি কালো পাথরের উপর উৎকীর্ণ। মস্তকে জটা, বক্ষে পৃষ্ঠে প্রসারিত। কিছুটা চূড়াকারে মস্তকে ধৃত। দ্বিনেত্রা, অষ্টভুজা, উপরে দুই হাতে একটি হাতি ধরা আছে। অন্যান্য হাতে প্রহরণ আছে কিন্তু সিঁদুরে সে সব দেখা যায় না। দেবী শববাহনা।

তারকেশ্বরের কাছে মহুলা গ্রামে মন্দিরে দেবীর মাটির মূর্তি ত্রিনয়ন, সুদর্শন, হাতে নানা প্রহরণ, গলায় মুন্ডমালা, পদতলে শিব শায়িত।

টাটানগরের কাছে গালুডি স্টেশনে নেমে মহুলিয়াতে কালীমূর্তিকে রংকিনী হিসেবে পূজা করা হয়।

রংকিনীর সাথে মহুয়া [মহল] গছের সম্পর্ক খুব নিবিড়। দেবীর অবস্থান বহুক্ষেত্রেই মহুয়া গাছের নীচে, গ্রামের নাম পর্যন্ত মহুয়ার নামে হয়। এটাকে নজর রাখা দরকার।

ব্যাপ্তি : ঘাটশিলা, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, সিংভূম জেলা।

উদ্দেশ্য : অভীষ্ট পূর্ণ হওয়া। বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভ করে। কলেরা-হাম-বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রকোপ কমে বলে বিশ্বাস।

২ সিনি

মূর্তি : নেই। মাটির হাতি ঘোড়া প্রতীকে পূজা হয়। কোথাও প্রস্তর প্রতীকে পূজা হয়। কোথাও অমসৃণ একটি প্রস্তর খণ্ডে বিশেষ পূজার সময় দুটি চোখ আঁকা হয়।

ব্যাপ্তি : বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী।

উদ্দেশ্য : গ্রাম রক্ষয়িত্রী, শস্যদাত্রী, দয়াবতী বৃদ্ধা, তাঁকে তুষ্ট করলে সব বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অনেক স্থানে সর্বরোগ অপহর্তা মনে করা হয়। ভূতপ্রেতের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন বলেও অনেকে বিশ্বাস করেন।

● বাঁসলী, বাঁশুলী বা বিশালাক্ষী

মূর্তি : হরিদ্রা বর্ণ, এলোকেশী, সুদীর্ঘ ত্রিনয়ন, কখনো মুকুট পরা, উন্নত নাসা, দ্বিভুজা, এক হস্তে প্রহরণ অন্য হস্তে বরাভয়।

অন্যত্র চতুর্ভুজা মূর্তি, সেখানে রক্তাম্বর পরিহিতা, গলায় ও কটি-দেশে নরমুণ্ডমালা, রক্তজবাভূষিতা, পাশে ভৈরব।

ব্যাঘ্রবাহিনী অভিচারিকা মূর্তিতেও দেখা যায়।

উড়িষ্যায় অশ্বমুখী মূর্তি দেখা যায়।

প্রতীক মূর্তিতে : পশ্চিম বাংলায় হাতি ঘোড়ার পোড়ামাটির মূর্তি, উড়িষ্যায় শিলাখণ্ডে কোন কোন জায়গায় বস্ত্রখণ্ডে পূজা।

ব্যাপ্তি : বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, ২৪পরগনা ও উড়িষ্যা।

উদ্দেশ্য : ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুরে জেলেরা মাছ ধরার আগে পূজা করেন। উড়িষ্যায় জেলেরা পূজা করেন। বর্ধমানে রুইদাসেবা [মুচি] রোগমুক্তি ও তুকতাক [অভিচার ক্রিয়া ?] করার জন্য পূজা করেন। সুন্দরবনের কোন কোন অঞ্চলে ব্যাঘ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে পূজা করা হয়।

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের বনদেবতার স্বরূপ-সন্ধান

পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো

দেবতাদের সম্বন্ধে চিন্তা তো বনের বৃক্ষেরা করতে পারে না। অরণ্য-নিবাসী মানুষেরা তাঁদের প্রয়োজন, বিশ্বাস ও অরণ্যকেন্দ্রিক জীবনধারাকে কেন্দ্র করে অরণ্যের দেবতাদের নাম, মাহাত্ম্য ও ধর্মীয় জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে। স্বভাবতই এই প্রক্রিয়া একটি বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থিতিতে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে গড়ে উঠতে থাকে যা মূলত প্রকৃতি-পূজা বা সর্বপ্রাণবাদরূপে স্বীকৃত। আর ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশে অরণ্য ও অরণ্যচারী কিংবা পরবর্তীকালে কৃষক মানুষদের একাট সুনির্দিষ্ট অবদান সকলেই স্বীকার করেন। জঙ্গল হাসিল করে যে সমস্ত জনপদ গড়ে উঠেছিল তা বহু গোষ্ঠীর মানুষের স্বাভাবিক লেন-দেন বা একে অপরের প্রতি নির্ভরতার কারণেই এক একটি জনপদ ছিল নিজ নিজ বৈচিত্র্যে ও প্রাণরসে ভরপুর। আজও অরণ্যনির্ভর যে সমস্ত গোষ্ঠী জঙ্গলকেন্দ্রিক জীবনের মায়া ত্যাগ করতে পারেনি তার বহু কারণের মধ্যে একটি হলো বন-দেবতা সম্পর্কীয় জীবনের মূল্যবোধ। এ মূল্য-বোধ বর্তমান সভ্য মানুষদের মত দাসত্ব-প্রভুত্ব কিংবা উচ্চ-নীচ ছোটবড়, কিংবা বিভিন্ন থাকে বিভক্ত কোন ঐতিহ্যবাহী চিন্তা-ভাবনা থেকে আসেনি। ছোট ছোট গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবনে সমতার, আনুপাতিক সাহায্যের ও পারস্পরিক সহন-শীলতার একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক সংগঠনের তাঁরা জন্মও দিয়েছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাতে বৃহৎ গোষ্ঠীগুলির মধ্যেই নানা সংঘাত ও বিচ্ছিন্নতা জন্ম দিয়েছিল বন-কেন্দ্রিক জীবন ও চাষী জীবনের নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক টানা পোড়েন যার ফলে গোষ্ঠীগুলি টুকরো টুকরো হয়ে নিজেদের দূরত্ব বাড়িয়ে ফেলেছে এবং পরবর্তী যুগে ও সময়ের মাপকাঠিতে সেই টুকরো গোষ্ঠীগুলিই নিজেদের এক একটি সামাজিক দেওয়ালের মধ্যে

আটকে দিয়েছে-যার ফলে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবে তাঁদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে; এবং নারী-বিনিময়কে এই সামাজিক বেড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। জঙ্গল-কেন্দ্রিক সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন তাই অরণ্যচারী মানুষগুলিকে এখনও যে শক্ত বাঁধনে আটকে রেখেছে তার কারণ একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থিতি ও জীবন ধারণের জন্য অরণ্য নির্ভরতা।

বিহারের সিংভূম জেলার গঁড়/গৌড/গোড় নামে পরিচিত একটি বিশাল জন-গোষ্ঠীর উপর ক্ষেত্রানুসন্ধান করতে গিযে লক্ষ্য করি যে আজ তাঁরা বহু থাকে বা বহু উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। যেমন নন্দ-গোড়, কৃষ্ণ-গোড়, মসধা গোড়, ঝারুয়া-গোড়, অনাডিয়া গোড়, ধুরুয়া, গিরি গোড়, বাগাল ইত্যাদি। উত্তর-পূর্ব ছোটনাগপুর মালভূমির সুবিশাল অংশের (যা বিন্ধাচল পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত, ভূ-বিশারদেরা যাকে বলেন গন্ডোয়ানা মালভূমি) শোন, শংখ, কারো, কুইলী, কোযেল, বৈতরণী, অংগিরা, ঘরঘরি থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণীর ও মহা-নদীর অববাহিকাতে এদের আদিবাসভূমি। পরবর্তীকালে দামোদর, সুবর্ণ-রেখা, ও কংসাবতী অববাহিকাতেও এরা বসবাস করছেন, যুগযুগ ধরে। এঁদের উৎপত্তি সংক্রান্ত একটি গল্প বা রূপকথা আমি সংগ্রহ করি শ্রী ইন্দ্র গোপের কাছ থেকে। রূপরকথাটি নিম্নরূপ:

"আষাঢ় মাসের শেষে, শ্রাবণের ঘন বরষাতে গমহা নামে এক অতি দরিদ্র গড়ু কৃষক তাঁর ক্ষেতে কাজ করার জন্য খুবই ব্যস্ত ছিল। তাঁর কাজের সংগী ও সহযোগী ছিল তাঁরই পুত্র 'কাড়ো' এবং কন্যা 'কুইলী'। প্রথমা স্ত্রী মারা যাবার পর তিনি দ্বিতীয়বার বিযে করেন। ক্লান্ত হয়ে তাঁরা বাড়ি ফেরে। তার পরদিন ছিল পবিত্র 'গমহা' উৎসবের দিন। কিন্তু সৎমা জোর করে 'কাড়ো' আর 'কুইলী'কে কাজ করতে পাঠালেন। কিন্তু ঐ পবিত্র দিনে পরম্পরাগত রীতি অনুসারে মাঠে কাজ-কর্ম করা ছিল নিষিদ্ধ। সৎ মায়ের বটুক্তিতে তাঁরা কাজ করতে যেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু সামাজিক নিষেধ ভঙ্গ করার অপবাধে তাঁদের জীবনে অভিশাপ নেমে এলো। বৃদ্ধ গঁড় গমহা যখন বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর পুত্র-কন্যাদের দেখতে না পেয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁদের কথা। কিন্তু স্ত্রী কোন জবাব দিলেন না। ওদিকে 'কাড়ো' ও 'কুইলী' তখন সাপে রূপান্তরিত হতে চলেছেন। জঙ্গলের ক্ষেতে গিযে বৃদ্ধ গমহা দেখলেন যে তাঁর পুত্র ও কন্যা সাপে রূপান্তরিত হচ্ছেন।

প্রচন্ড বৃষ্টিতে সামনেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। গমহা দেখলেন দুটো ঝরনার সৃষ্টি হয়েছে। 'কাড়ো' ও 'কুইলী' তাঁদের বৃদ্ধ পিতাকে কোন মতে জানালেন যে একটি মাটির হাঁড়িতে তাঁদের মৃতা মায়ের সামান্য কটা অলংকার তাঁরা কোথায় রেখেছেন। অবশেষে অসহায় পিতার চোখের সামনে তাঁর স্নেহের পুত্রকন্যা সম্পূর্ণ সাপে পরিণত হলেন। সেই দুটো সাপকে সযত্নে ঐ দুটি ঝরনাধারার জলে ছেড়ে দিলেন বৃদ্ধ গমহা। আজও ঐ দুটি নদীর নাম 'কাড়ো' ও 'কুইলী'। সমগ্র গঁড় গোষ্ঠী সহ সমস্ত শ্রেণীর মানুষ আজও 'গমহা' (সমার্থক উৎসব-রাখী পূর্ণিমার দিন) উৎসবের দিন তাঁদের স্মরণ করে।

চাঁইবাসা, চক্রধরপুর, সম্বলপুর, রাঁচী, কেওঁঝোর এলাকাতে ক্ষেত্রানুসন্ধান চালাতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি যে গঁড় (মগধা) গোষ্ঠীর 'কিল্লী' (সমার্থক গোত্র) গুলি বেশীর ভাগই জঙ্গলকেন্দ্রিক, যেমন হাতি, ভৈসা, হনুমত, বাঘ, (চুয়ারী বাঘ, মোহনা বাঘ, কেনুয়া বাঘ, পরামানিক বাঘ), নাগ (কদম বংশী নাগ, দুধিয়া নাগ) কুটার (ছোট্ট হরিণ) যেমন সুবর্ণ কুটার, বাঙ্কি কুটার, তাছাড়াও আছে সুয়া (টিয়া), বালি হাঁস ইত্যাদি।

মগধা গঁড় গোষ্ঠী প্রকৃতি পূজারক (সারণা)। সারণা বা জাহির থানে কেন্দু ও শাল গাছকে তাঁরা পূজা করেন। 'সারণার' (গ্রামের বাইরে দেবতাদের জন্য নির্দিষ্ট বৃক্ষরাজির স্থান) কেন্দু গাছের ছোট্ট ডাল তাঁদের কাছে একতা, সাহসিকতা ও শান্তি দৌত্যের কাজ করে। তাঁদের জঙ্গলের দেবতাদের নাম হলো ডেলরাবুরু, দালামাবুরু, সিঙ্গাসো, চামরু, পাংগা, অঙ্গীবীর, বাঘাবলা, ঘেড়াহাড়ি, সারান্ডা, শিমলীপাল প্রভৃতি। গঁড় গোষ্ঠীর জীবনে হাতির উপদ্রত সব সময়েই ছিল। এই ভয়ানক জন্তুকে বশ করার মত তাঁদের কোন কৃৎ-কৌশল না থাকার জন্য পূর্ব-পুরুষদের শক্তির উপর তারা ভরসা করতেন। তাই মৃতের জন্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াতে দেখা গেছে যে 'বা-মাটি' আনা হয় পোড়ানো দাহ ক্ষেত্র (শবদাহ) স্থান থেকে। তার-পর পুকুরের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে "হস্তিপৃষ্ঠে আরোহী" একটি মাটির পুতুল তৈরি করা হয়। সেই পুতুলের কাছে মিষ্ট ভাত (নুন ছাড়া তরকারি এবং তা অবশ্যই হলুদ ছাড়া) দেওয়া হয় পূর্ব-পুরুষের উদ্দেশে। 'মিটাভাত' অবশ্যই কাঁচ শালপাতাতে মোড়া থাকে এবং মোড়কের উপর একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। গঁড়রা বিশ্বাস করে যে মৃত পূর্ব-পুরুষেরা তাঁদের বংশধরদের জন্য

"দুঃখ ছাড়া, সুখ আনিছু" (দুঃখ ছাড়া সুখ তাঁরা আনছে)।

আমরা এবার বলবার চেষ্টা করবো 'দেশওয়ালী মাঝি' গোষ্ঠীর কথা বলতে। এই গোষ্ঠী সাঁওতালদের একটি উপভাগ। বর্তমানে সম্পূর্ণ একটি গোষ্ঠী যাঁরা নারী বিনিময় নিজেদের মধ্যেই সীমিত রেখেছেন। যে গোষ্ঠীগুলি পুরুলিয়া সিংভূম ধানবাদ বাঁকুড়া মেদিনীপুরের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকাতে প্রথম জঙ্গল সাফ করে বসবাস করেছিলেন তাঁদের মধ্যে 'দেশওয়ালী-মাঝি' ও কুড়মী মাহাতোরা অন্যতম। সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬), সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) পর ইংরাজদের দারুণ উৎপীড়নের ও উচ্ছেদের মুখোমুখি হবার সাধ্য ছিল না কিছু চাষীর।

তৎকালীন রাজা-জমিদারদের নায়েব গোমস্তাদের প্রভাবে আঞ্চলিক ভাষা তাঁরা রপ্ত করেছিলেন, নিজেদের 'ঠার' (ভাষা) তাঁরা ভুলতে বসেছিলেন। ইংরাজ উৎপীড়নের মুখেই এরা 'দেশওয়ালী' মাঝি নামে পরিচিত হন। অন্যদিকে 'ঠার' ভাষী সাঁওতালরা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। দেশওয়ালীদের বেশীর ভাগ দেব-দেবীই বনকেন্দ্রিক। যেমন কসুত, জাহিরা, রুদুরা, দারাগাড়া বাচ্চিবুড়ী, বড়পাহাড়, বন-কুমারী, রাঙগাহাঁড়ি, মাঘী পুজো, চণ্ডকো-সিনী, করম, বাঁতাল। তাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব শারুল। কুড়মী-মাহাতো গোষ্ঠী সহ বহু অন্যান্য আঞ্চলিক গোষ্ঠীর মানুষ দেশওয়ালী মাঝিদের মতই একই দেব-দেবী পুজো করেন। দেশওয়ালী মাঝিদের প্রধান সমাজকর্মী শ্রীঅতুলচন্দ্র মাঝি (প্যাঁচাড়া) শারুল/শারহুল/বা শারুল পুজো সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন এই উৎসবের অসামান্য গুরুত্বের কথা। প্রাকৃতিক দেব-দেবী (ঠাকুর-ঠাকরুণ) সমাজ জীবনকে পরিচালনা করে এবং এই কল্পিত অদৃশ্য শক্তির প্রতি সমস্ত মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থেকেই এই সব প্রতীকী উৎসবের সুচনা।

গ্রামের 'লায়া' (পুজারী) এই পুজা ও উৎসবের দিনটি ঘোষণা করেন। 'গড়াইত' (লায়ার সাহায্যকারী) উৎসবের নির্দিষ্ট একদিনে পূর্বে গ্রামের মানুষদের হাঁক দেয় "লায়া ঘরে শারুলের ডাক হচ্ছে হে-হে"। পুজার পূর্বদিন সন্ধ্যায় গ্রামের লোক 'লায়া ঘরে' জমা হন। গ্রামের দু-চারজন 'গুণী' (ভবিষ্যৎ বক্তা) ব্যক্তিকে ডেকে আনা হয় বিশেষ আদর করে। এই 'গুণীরা' তাঁদের 'ঝুপান' (দেবতা ভরের ফলে যে দেহকম্পন হয়) দ্বারা বলে দেন যে গ্রামের

কোন কোন ঠাকুর কেমন আছেন। ঠাকুর ঠাকুরুণদের রাগ করা বা ভালো থাকার উপর নির্ভর করে গ্রামের মানুষের ভালো মন্দ।

'গুণীদের' ঝুপা নামার জন্য লায়াকে আতপচাল, ধুনা, ও আগুন যোগাড় করে রাখতে হয়। গুণীরা এসে হাত-পা ধুয়ে তুলসী থানে বসে। আতপচাল মাটিতে রাখে এবং ডান হাতের মুঠো দিয়ে আতপচাল দিয়ে মাটিতে আঘাত করে করে ঝুঁপতে থাকে। যখন তাঁরা অস্বাভাবিকভাবে দেহের কম্পন আরম্ভ করে তখন বলা হয় তাঁদের উপর 'ঠাকুর ভর' করেছে। গ্রামবাসীরা গুণীদের জিজ্ঞাসা করে 'ঠাকুর কি ভর করেছে'? তখন গুণী ঝুঁপতে ঝুঁপতে বলে কোন ঠাকুর-ঠাকরুণ রাগ করেছে বা কোন কোন ঠাকুর-ঠাকরুণ ভালো আছে। ঠাকুর-ঠাকরুণ যাঁরা রাগ করেছে তাদের জন্য পূজার ব্যবস্থা, মানত শোধের জন্য মোরগ, পাঁঠা, শুকর বা ভোগের ব্যবস্থা করতে হয়।

মাটির হাতি/ঘোড়াও ঠাকুরের সন্তুষ্টির জন্য দেবার কথাও তাঁরা বলেন। গুণীদের কাছ থেকে এই সব কথা শুনেই পূজোর দিন 'মুদা' বা ভোগ দেওয়া হয়। তাই 'মুদা' একটি শালপাতার 'দনা'তে ধুনো ও আগুন দিয়ে গুণীকে উদ্দেশ করে বলা হয় 'লও ঠাকুর মুদা'। ঐ ভোগ নিয়ে গুণী আগুন সহ ধুনোকে মুখে নেবার ভান করে খুব জোর করে। উপস্থিত লোকেরা তখন সেগুলো ছাড়িয়ে নেয়। এবার গুণীরা ঝুঁপতে ঝুঁপতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় মাটিতে। অজ্ঞান হবার আগে বিভেন্ন গুণী বিভিন্ন ঠাকুর-ঠাকুরুণের চাহিদার কথা গ্রামবাসীদের জানিয়ে দেন।

পূজার দিন 'গড়াইত' গ্রামের ঘরে ঘরে জানিয়ে দেন ঘর-দুয়ার গোবর দিয়ে লেপাব জন্য। মেয়েরা ভোরবেলা থেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সেরে নেন। এই কাজ শেষ হবার পর 'লায়া' ঘরে ঘরে পূজার সাজ নিতে যান আতপচাল গুড়, ঘি, সিন্দুর, সিদ্ধচাল, মোরগ, পায়রা বাচ্চা, মাটির হাতি, ঘোড়া, সহ সিন্নী যোগাড় করে। পাঁঠা শুকর পূজাব স্থানে নিয়ে যেতে বলে দেন। গ্রামের ছেলেমেয়েরা 'শালুই' (শাল-ফুল) সংগ্রহ করে দেন 'লায়াকে'। এই পূজার জন্য 'শালুই' চাইই। 'লায়া' টাঙ্গি বা তলোয়ার নিয়ে জাহিব থানে উপস্থিত হয়। জাহির থানে পূজার পর অন্যান্য দেবী দেবতার পূজা করেন। বলির মোরগ, পাঁঠা, শুকর মাংস গ্রামের লোকেরা পুড়িয়ে পিঠে করে বা 'ঘন্ট' রান্না করে। লায়া আনন্দের সঙ্গে প্রসাদ বিতরণ করেন। পূজাতে ঠাকুর-

ঠাকরুণদের হাঁড়িয়া বা হাঁড়িয়ার চাল দেওয়া হয়। পূজার মাংস মেয়েদের খাওয়া নিষিদ্ধ।

এরপর 'শালুই গুঁজা' অনুষ্ঠান। পূজা শেষ করে শালফুলগুলি নূতন কুলোতে সাজিয়ে নিয়ে গ্রামবাসীরা ঘরে ঘরে যায়। শালুইফুল প্রতি ঘরের চালে গুঁজে দেন। যখন যে ঘরে লায়া প্রবেশ করেন সেই বাড়ির তরুণী বধূ বা কন্যা লায়াকে হলুদ-জল দিয়ে পা ধুইয়ে দেন। লায়াকে হাঁড়িয়া খেতে দেন। লায়ার সংগে পুরুষেরাও হাঁড়িয়া খান। শালুইফুল গুঁজার সময় গ্রামের যুবক-যুবতীরা শালফুল মাথায় গুঁজে ড্যাঁড় নাচের বা পাতা নাচের সুরে ঝুমুর গান করেন ও দলবন্ধ নাচ করেন। লায়া এইভাবে গোটাদিন সমস্ত গ্রামে শালুই গুঁজে দেন। সাদাদিন তরুণ-তরুণীরা আনন্দে বিহ্বল থাকেন। শারহুল পূজা না হলে দেশোয়ালী মাঝি নূতন পাতা, ফুল, মহুয়া ফুল কোন কাজে লাগায় না। শারহুল পূজা পার হবার পর এরা 'মহুয়া ফুল' সেদ্ধ খায়। ঠিক সম্পূর্ণ একই ধরনের অনুষ্ঠান ক্ষেত্র অনুসন্ধান কালে সিংভূমের বালিডিহা ও বড় কাদল গ্রামে কুড়মী মাহাতোদেরও করতে দেখেছি।

সাঁওতাল গোষ্ঠীর বনদেবতা সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যেতে পারে যে সাঁওতাল গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ জীবনদর্শনের আধার হচ্ছে বন। শ্রী মঙ্গলচন্দ্র সরেন (শিলালিপি ১৯৭৯; দ্বিতীয় সংকলন, জামশেদপুর) 'বাহা পূজা ও উৎসব' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন—"আমরা জাহের স্থানে বাহা পূজারও অনুষ্ঠান করি। প্রত্যেকটি জাহের শাল গাছকে কেন্দ্র করিয়াই স্থাপিত হয়; আমাদের কাছে শাল গাছই শ্রীভগবানের রূপ। আমরা শাল গাছকে সারি সারজম বৃক্ষ বলি। এই সারি সারজম শব্দকে ভাগ করিয়া পৃথক পৃথক উচ্চারণ করিলে তিনটি শব্দ হয়। যথা—সারি, সার, জম। সারি শব্দের অর্থ সত্য। সার শব্দের অর্থ পবিত্র মঙ্গলদায়ক এবং জম শব্দের অর্থ খাদ্য বা খাওয়া। একটি সারি সারজম বৃক্ষরূপী ভগবানের নামের ভিতর দিয়া শ্রীভগবানের তিনটি মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দুদের মধ্যেও সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম মন্ত্র উচ্চারিত হইতে শোনা যায়।......... লিটা ও জাহের বুড়ী যে ঘর তৈরী করিয়া ছিলেন ঐ মর্তের বাড়ীতে শ্রীভগবান শাল গাছ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। উহার একটি গান এখানে উল্লেখ করিতেছি। গানটি বিবাহের গান—

জ্বরিতে সারজম অমন লেন দ য়্ হারা লেন দ

অমন লেন দ য়্ হারা লেন দ

জ্বরি সার জম দারে ব্টারে

চাঁদো লেকা য়্ জাহেরা এরা।

(একজোড়া শাল গাছ জন্মিয়াছিল ও বাড়িয়াছিল, ঐ জোড়া শাল গাছের নীচে ভগবতীর মত জাহের এরা শোভা পাইতেছে।)"

সমগ্র সাঁওতাল 'বিনতিতে' (মৌখিক শ্রুতিতে) বনভূমি ও বনদেবতাদের স্থান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বনভূমি আবিষ্কার, জনপদ সৃষ্টি, নগর, প্রদেশ সব কিছুই বনভূমিকে কেন্দ্র করে।

"অকয় মায় চিয়া লেৎ হো বির দিসম দ"

(কে বনভমি আবিষ্কার করেছেন ?)

"মারাং বুরুয় চিয়ালেৎ হো বির দিসম দ"

(মারাং বুরু এই বনভূমি আবিষ্কার করেছেন।)

অকয় মায় বেরেল লেৎ হো-বির দিসম দ

অকয় মায় বস্তিলেৎ আতো ডিয়াড়ো

মারাং বুরুয় বেরেল লেৎ বির দিশম দ

জাহের এরায় বস্তিলেৎ আতো ডিয়াড়ো ।

(কে বনভূমি সঞ্জীবিত করিয়াছিল ? মারবুরু বনভূমি সঞ্জীবিত করিয়াছিল। কে গ্রামগুলিব বসতি স্থাপন করিয়াছিল ? জাহের এরা বসতি স্থাপন করিয়াছিল গ্রামগুলিতে।)

সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ, সুন্দগড়, কেঁওঝোরের হো আদিবাসী মানুষ নিজেদের পূর্বপুরুষ বা আদি-মাতা পিতা সম্পর্কে একটি রূপকথা বা গল্প বলেন। জানুম সিং পিঙ্গুয়া ও সোনা সিং পিঙ্গুয়ার কাছ থেকে সংগৃহীত এই গল্পটিও অরণ্যবাসী মানুষের অরণ্য-ভাবনার অসাধারণ দলিল।

"অত্যন্ত প্রাচীনকালে বাঃ পরব নামের কোন উৎসবই অনুষ্ঠিত হত না। বলা চলে, পালন করা হত না। একটি পারিবারিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে। যে পরিবারে ঘটনাটি ঘটে, সেই পরিবারটিকে হো সম্প্রদায়ের আদি-পিতামাতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিংবদন্তিটি হল এই, অনেক অনেক দিন আগে জোসোনা এবং ডোনকা নামে দুই ভাই ছিল, ওরা

একসাথে বাস করত। জোসোনার বিয়ে হয়নি কিন্তু ডোন্‌কার বিয়ে হয়েছিল। ডোন্‌কার একটি পুত্র সন্তান ছিল, নাম ছিল টোক্‌ড়েয়াঁ। ডোন্‌কার স্ত্রীর নাম ছিল পাঙেগলা। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেই সময়ে টোকড়েয়াঁর বয়স ছিল নয় দশ বৎসর। বসন্ত ঋতু তখন শুরু হয়েছে। বসন্ত পঞ্চমীর দিন এলো। ওই দিন জোসোনা ডোন্‌কা আর টোক্‌ড়েয়াঁ তিনজনে মিলে 'সায়ে' জঙ্গলে শিকার করবার জন্য গেল। ঘরে কেবল ডোন্‌কার স্ত্রী পাঙেগলা থাকল। ওরা তিনজনে মিলে জঙ্গলে শিকার করতে লাগল। বাচ্চা টোক্‌ড়েয়াঁকে এক জায়গায় ছেড়ে রেখে ওরা দু'ভাই শিকার করতে করতে জঙ্গলের বেশ খানিকটা ভিতরে ঢুকে গেল। হঠাৎ একটা হরিণ দেখতে পেয়ে ওরা হরিণটাকে তাড়া করলো। হরিণ প্রাণ বাঁচাবার জন্য দৌড়ে পালাতে লাগলো। ঐ পথে দাঁড়িয়েছিল টোক্‌ড়েয়াঁ। দৌড়ে পালাবার সময় হরিণ তার শিং-এর ওপর তুলে তাকে নিয়ে পালিয়ে গেল। জোগোনা আর ডোন্‌কা অনেক পিছনে ছিল। তারা এত সব কান্ড দেখতেই পেল না। হরিণ না পেয়ে ওরা এবার বাচ্চার খোঁজ করতে শুরু করল। কিন্তু বাচ্চাটিকে খুঁজে পেল না। তোলপাড় করে ওরা সারা জঙ্গল খুঁজলো। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলো না। অবশেষে দু-ভাই পরস্পরকে দোষারাপ করতে লাগলো। বিষণ্ণ চিত্তে জোসোনা এসে পাঙেগলাকে খবর দিল। ছেলে হারিয়ে যাওয়ার বেদনাতে পাঙেগলার মাতৃহৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগলো। গান গেয়ে গেয়ে সে কাঁদলো ঃ

নোনসেদো চিনা নাগুয় মে' নোনমে দো
নোনসেদো জিলু দিরি এও রে নোনমে দো
গালাএও তাই লেকাচাঃ নোন মেদো।

(স্নেহের ছেলের জন্য পথ চাওয়া, দুলাল ছেলের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকা, স্নেহের দুলাল ছেলেকে তুমি হরিণেব শিং-এ ফুলের হারের মতো পরিয়ে দিলে।)

ডোন্‌কা সারা জঙ্গল ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলো। ছেলের শোকে তার বুক ভেঙ্গে গিয়েছিল। অনুতপ্ত হৃদয়ে সে মাঝে মাঝে শিউরে উঠছিলো। অন্নজল স্পর্শ না করে সে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ার পর সে স্বপ্ন দেখলো, কে যেন তাকে বলল, যে ফুল কখনো ম্লান হয় না, সেই ফুল তুমি যদি গলায় পরো তবেই তুমি তোমার ছেলের দর্শন পাবে। স্বপ্নের এই কথা

তার মনকে ভীষণ নাড়া দিল। কাক-ভোরে উঠেই ডোন্‌কা চুপচাপ নিঃশব্দে একাই 'সায়ে' জঙ্গলের দিকে রওনা হলো। স্বপ্নের কথাটা পরখ করার জন্য সে যে ফুল সামনে পেলো তাই অঙ্গে ধারণ করতে লাগল। কিন্তু সব ফুলই কিছুক্ষণ পর ম্লান হয়ে আসতে লাগল, শুকিয়ে গেল। ডোন্‌কা খুবই বিষণ্ণ বোধ করতে লাগল। হঠাৎ দেখল অজস্র গাছে আরো এক শ্রেণীর ফুল ফুটেছে। সেগুলো পরখ করে এখনো দেখা হয়নি। ফুলের নাম শালফুল, ওরা বলে 'সবজোম বাঃ'। শালফুল পরে ও শরীরে ধারণ করে দেখল। নাঃ, এ ফুল শুকিয়ে বা ঝিমিয়ে পড়ে না। শাল ফুলে সর্বাঙ্গ ঢেকে ডোন্‌কা সমস্ত জঙ্গল ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে সে দেখতে পেলো হরিণসহ তার ছেলেকে। হরিণের শিং-এর উপর তার ছেলে মালার মত জড়িয়ে আছে। হরিণটিও পরম নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঐ অবস্থাতে। হরিণটিকে দেখতে পেয়ে ডোন্‌কা তার ধনুকে তীর জুড়ে ঠিক নিশানা করলো। অব্যর্থ তীরের আঘাতে হরিণটি মরে গেল! তখন ডোন্‌কা মৃত হরিণসহ ছেলেকে কাঁধের উপর ফুলের মতো বয়ে নিয়ে ঘরে ফিরলো।" (অনুবাদ—বঙ্কিম মাহাতো)

যেহেতু এই উৎসবটি বাঃ পরব বা পুষ্পোৎসব তাই শালবৃক্ষে পুষ্পোদ-গমের পূর্বে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হতে পারে না। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে এই উৎসবের জন্য হাঁড়িয়া তৈরী করতে হয়। এতে তিন দিন সময় লাগে। হাঁড়িয়া তৈরী হলেই এই উৎসব শুরু হয়ে যায়। তিনদিন ধরে এই উৎসব চলে। 'দিউরী' (পূজারী) বীরবোঙ্গা, নাগেএরা ইত্যাদি বনদেবতাদের পূজা করেন। পুষ্পভারে সজ্জিত একটি শাল-গাছের ডাল মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়।

এই ডালটি কিংবদন্তির হরিণের প্রতীক। পূজা অনুষ্ঠান হলে সবাই খেয়ে-দেয়ে হাঁড়িয়া খেয়ে ঐ ডাল থেকে এর একটি ফুল ছিঁড়ে অঙ্গে ধারণ করে। তারপর এক বিশেষ দূরত্ব থেকে ঐ ডালটি বিদ্ধ করার জন্য তীর ছোঁড়া হয়। যে তীরবিদ্ধ করতে পারে তার মাথায় নূতন কাপড় দিয়ে পাগড়ি বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর যেভাবে ডোন্‌কা নিজের ছেলে ও হরিণকে কাঁধের ওপর তুলে এনেছিলো তেমনি ঐ শালডাল ও ডালবিদ্ধকারী লোকটিকে কাঁধের ওপর তুলে ঘরে নিয়ে আসা হয়। সঙ্গে চলে নাচ ও গান। দিউরীর আঙিনাতে নাচতে নাচতে ডালটি ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়—এই সময় এই গানটি তারা গায়ঃ

দোঁসিয়ালাগ্‌ সপেরের, দোঁসিয়ালাগ্‌ নাপামুম সোঃ রে

দিরী রুগুড়ী রুগুড়ী, হাসা রুগড়ী-রুগড়ী

তেগা রাপুড় আলাগ্ চলপা রাপুড় আলাগ্ সোঃ রে।

(হাজারো জওয়ান মরদ আছে। হাজারো জওয়ান যুবতী আছে, মুরুম কাঁকরে ভরা জমিন, শাদা পাথরে ভরা জমিন, পাথরে কাঁকরে ভরা এই জমিন, পায়ের চোটে এই জমিকে ভাঙতে হবে। পাথর-কাঁকর গুঁড়ো করে সমতল করতে হবে। শবাধারের চওড়া তক্তা দিয়ে সমতল করতে হবে।)

পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডী থানার কুড়মী, কুইরী, লোহার, খাসি ও ভূমিজদের ওপর ক্ষেত্রানুসন্ধান কালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে 'সিঝাম' পরবের পর থেকে অর্থাৎ বসন্ত আগমনের সংগে সংগে 'টাঙিগ-টাঙ্গা' উৎসব পালন করা হয়। মাঠা-বুরু পাহাড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ ১৫ দিন থেকে একমাস টাঙিগ দিয়ে বা কুঠার দিয়ে কাঁচ-গাছ বা ডাল কাটা থেকে বিরত থাকেন। যত দিন পর্যন্ত শারুল উৎসব হচ্ছে ততদিন তাঁরা এই বিধি নিষেধ মেনে চলেন। এমন কি এই নিয়ম ভঙ্গ করলে গ্রামবাসীরা দোষী ব্যক্তিকে জরিমানা পর্যন্ত করেন। জমিদারী আমলে এই সামাজিক আইন ভীষণ কড়া হাতে পরিচালনা করা হতো। ময়ূরভঞ্জের পলাশবধা, চিতোড়া, মাকুন্দ, ও ভুরখুণ্ডি গ্রামের কুড়মী মাহাতদের মধ্যে এই গাছ না কাটার নিয়ম এখনও খুব কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হয়। নিয়ম ভঙ্গকারীরা সামাজিক বয়কটের সম্মুখীন হন।

কুড়মী মাহাতোদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা বড়পাহাড়।

হাজারীবাগ জেলার পরেশনাথ পাহাড়কে ঐ দেবতা বলে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও 'পাঁচবহনী,' 'সাতবহনী' নামক দেবদেবীর কথাও তাঁদের লোককথা থেকে পাওয়া যায়। এছাড়া হাতির উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য দালমা পাহাড়ের কোলে বান্দোয়ান (পুরুলিয়া) পর্দমদা (সিংভূম) অঞ্চলে 'চড়কাসিনী' নামে একটি বনদেবীর পূজা করেন সমস্ত শ্রেণীর মানুষ। বিশেষ করে কৃষকেরা। আজও যেভাবে হাতির উপদ্রব হয় সমগ্র দালমা পাহাড় সন্নিহিত অঞ্চলে তার একমাত্র কারণ হাতি অধ্যুষিত বনের মধ্যে তাদের খাদ্যাভাব। তাই দলে দলে যে কোন সময় বিশেষ করে আশ্বিন মাসের শেষের থেকে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ পর্যন্ত হাতির উপদ্রব চরমে ওঠে। হাতিদের দলবদ্ধভাবে ধান ক্ষেতের ধান নষ্ট করার ভয়াবহতা প্রতিবৎসর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গ্রামবাসীরা 'চড়কাসিনী' দেবীর পূজা করলে হাতির উপদ্রব থেকে রক্ষা পান বলে তাঁদের বিশ্বাস।

জঙ্গল কেটে এবং জঙ্গলের দেব-দেবীকে মান্য করে যাঁরা জনপদগুলি স্থাপন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক যে সহনশীলতা ছিল, এবং যে সামাজিক সমানতা ও ঐক্য ছিল তার প্রতীক ছিলো 'ঘুঠকাঠি' স্বত্তাধিকার। এই 'ঘুঁঠকাঠি' কৃষকদের সম্পর্কে রাধাগোবিন্দ মাহাত বলেছেন, "পোড়াহাটের গ্রামপ্রধান মুন্ডা হইলে মুণ্ডা, হো, গোয়ালা অথবা কুম্ভার হইলে প্রধান, কুড়মি হইলে মাহাতো, নাসপুরিয়া হইলে গোঁনজু, সাঁওতাল হইলে মাঝি, ভুঞা হইলে তাঁহাকে নায়েক বলা হয়। পোড়াহাটের অধিকাংশ গ্রামপ্রধানই গ্রামের আদি বাসিন্দা অর্থাৎ ঘুঁঠকাঠিদারদের বংশধর। উত্তরাধিকার অগ্রজের, কিন্তু যাঁরা বহিরাগত (আদিবাসী নন) তাঁরা সাধারণত এই অধিকারের অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হন।"

সিংভুম গেজেটিয়ার থেকে উদ্ধৃত দিয়ে শ্রীমাহাত বলেছেন, "মুন্ডারী ঘুঁঠকাঠি ছাড়াও যে কোন কৃষক কর্তৃক জঙ্গলে এবং পতিত জমি উদ্ধার করার জন্য প্রজাস্বত্তের স্বীকৃতি সূচক "ঘুঁঠকাঠি' শব্দটি নিজের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।" মধ্য এবং উত্তর মানভুম, বর্তমান রাঁচীর পাঁচ পরগনা তথা হাজারীবাগের পূর্বাঞ্চল তো ঝাড়খন্ডী কুড়মীদের আদি বাসভূমি। "ইংরেজরা তাহাদের শাসনযন্ত্রকে মজবুত করিবার সময় এইখানের মানকী, মুন্ডা, পড়হা, পাহান এবং মাহাতোদের পরম্পরাগত সামাজিক সংগঠনগুলির উপর নজর দেয়। পাহান ছিল আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা, যাঁহার কাজ ছিল বোঁগা (দেব-দেবী) সন্তুষ্ট রাখা এবং মানুষ ও গবাদি পশুর মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি যাহাতে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখা। মাহাত ছিল ছোটখাটো শাসনতান্ত্রিক প্রধান।" তাই স্বাভাবিকভাবেই ঘুঁঠকাঠি স্বত্তের স্বত্তাধিকারী হওয়ার অর্থ হলো ঝাড়খণ্ডে বসবাসের আদিত্ব (অথবা প্রাচীনত্ব) প্রমাণিত করা। পরেশনাথ পাহাড় থেকে শুরু করে এই আদি বসবাসকারী সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষেরা আজও দলমা, বাঘমুন্ডি, কানাইশোর, অযোধিয়া, লিপাইপার্ট, জয়চাঁড়ী (জয়চন্ডী), শুশুনিয়া ইত্যাদি 'পাহাড়' পুজো করেন।

'পাতকুম' জনপদের (বর্তমানে ইটাগড় থানা এবং সুবর্ণরেখা জলাধার প্রকল্পের ফলে ১১০টি গ্রামের সলিল সমাধি ক্ষেত্র। বহু ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের সুবর্ণ সম্ভার ক্ষেত্র) সীমানাক্ষেত্র দেখলেই বুঝতে পারা যায় বনদেবী-দেবতাদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধার গভীরতা। একদিকে

বরাবিধা ঘাট, সেখানে ঘড়ালেংগি পাহাড় সুবর্ণরেখা নদীর ওপারে 'রুইয়ানী' জংগল দেবী। অন্যদিকে দুয়ারসিনী ঘাট (হেঁসলা, কর্মাডি পাহাড়, কালিমাটি পাহাড়)-এর পাদদেশে 'দুয়ারসিনী' দেবীর পীঠস্থান, আবার পুরুলিয়া বলরামপুর হয়ে সিরুমের পথে অযোধ্যা ও মাঠা পাহাড়ের মাঝে 'দুয়ারসিনী' দেবীর আরেক পীঠস্থান। অন্যদিকে লখনাসিংয়ের ঘাট। বানসা পাহাড় দেবতা ঘরসঁওয়ার সঙ্গে যুক্ত। ঘুঁটিঘাট-এর দেবতা মারাং খারা, পশ্চিমে সোনাহাতু জনপদ সংলগ্ন কুঠাম পাহাড়, বাসাহাতু পাহাডের দেবতা। এই বিস্তীর্ণ সমতল উর্বরা ক্ষেত্রের 'ভুইঞা' সরদাররা ছিলেন রাজস্ব ও অন্যান্য কর আদায়ের জন্য পঞ্চকোটের রাজা কতৃক নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে চোগা নিবাসী ৩৬০ মৌজার কুড়মীদের দেশ মন্ডলেরা (দীনবন্ধু মাহাতর পূর্বপুরুষ ছিলেন চতুভুর্জ মাহাত, যাঁর গোসম্পদ ছিল 'সিংহালাখা' অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার গরুর মালিক তিনি)। জয়চাঁদ মাহাতোদের পারিবারিক দেবতার নাম 'তীর' পুজা। ঐ তীরের মাধ্যমে তাঁরা এই অঞ্চলে অবাধ বসবাসের সুযোগ পেয়েছিলেন বলেই অন্যান্য ভূমিজ মানকীদের সঙ্গে একই পংক্তিতে তাদের নামও উচ্চারিত হয়। অন্যদিকে মানভূমের শেষপ্রান্তে দামোদর নদীর ধারে (বর্তমানে ধানবাদ জেলার) কুমোরজোড় গ্রামের দেশপ্রধান রাখহরি মাহাতো চন্ডীচরণ মাহাতোদের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেবীর নাম 'বনবড়াম' বা 'বনকুমারী'। অর্থাৎ ঝাড়খন্ডের সর্বত্র বন-দেবী ও দেবতাদের প্রভাব শুধুমাত্র ধর্ম্মীয় বিশ্বাসের ওপরই নয়, তাঁদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বৃহত্তর জীবনেও অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে থাকে।

পাহাড়ে জঙ্গলে ঘেরা বিস্তীর্ণ ভূখন্ডের জনপদ সৃষ্টির দৃশ্যতা তাঁদের সীমাবদ্ধ রেখেছে একটি নির্দিষ্ট ও বহুপরিচিত ভৌগোলিক এলাকায়। যেখানে শত দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্যেও তাঁরা নিরাপদ ভাবেন। আর এই নিরাপত্তাবোধের সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের বন-দেব-দেবীদের মাধ্যমে। বনভূমির এ মায়ার বন্ধন কাটানো খুবই শক্ত। জঙ্গলকেন্দ্রিক মানুষের সমস্ত কল্পনা, সামগ্রিক সৃষ্টি, তাঁর সূচনাজ্ঞাপক প্রতীকগুলি সব কিছুই সীমাবদ্ধভাবে তার ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সামগ্রিক সমাজভাবনাকে করেছে প্রভাবান্বিত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি জীবনছন্দে সে অনুভব করেছে জঙ্গল ও জঙ্গলের জীবজন্তু তার কত আপন, কত পরিচিত। এই সামাজিকীকরণে সস্নেহে প্রকৃতি তাঁকে করেছে

বড়, সে শিশু থেকে হয়েছে যুবক-যুবতী। তাই প্রতিটি গাছের ডগা থেকে কাণ্ড পর্যন্ত, সবকিছুই তার প্রয়োজনীয় বস্তু। কল্পনার আলোকে যে রূপকথা /ছড়া/গল্প আদিম মানুষ সৃষ্টি করেছিল, তার কেন্দ্রবিন্দু বনদেবতাদের ঘিরেই। বাইরের পৃথিবীর, সভ্যতাগর্বী পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তের মনুষের দক্ষতা, কুৎকৌশলে সহজ সরল সুন্দর মানুষগুলো নানাভাবে বিপর্যস্ত হলেও আপন মহিমা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বপরিচয়ের গৌরব জঙ্গলকে ঘিরেই পেতে চায়। এই নিরাপদ ও স্বপ্নময় জগৎকে সে কোনমতেই ত্যাগ করার কথা কল্পনাও করতে পারে না। বনদেবতারা তাকে যেম সজাগ করে দেয়। আঘাতের বদলে পাল্টা আঘাত দেবার জন্য।

ধারু ও কারুর ক্রমবিকাশ

সুহৃদকুমার ভৌমিক

মানুষের মতো অধিকাংশ দেবতাই প্রথম জীবনে অরণ্যবাসী ছিলেন। আমাদের পরিশীলিত সমাজের বহু দেবদেবীর উৎস অরণ্য-সভ্যতা ও মিশ্র হিন্দুসভ্যতার দেবদেবীর তুলনামূলক আলোচনায় তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশের রূপটি সহজে ধরা পড়ে। চণ্ডী, মনসা, শিব, শক্তির নানা রূপ, এমনকি বৈদিক ধর্ম ও ও ধ্যানধারণার পর উপনিষদের যে "ভূতানি-সর্বানি" বা সর্বভূতে আত্মার অস্তিত্ব এ সমস্তের উৎস কোল গোষ্ঠীর সর্বভূতে সর্বস্থানে "বোঙ্গা" বা শক্তির অস্তিত্বকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আমাদের হিন্দু সমাজের জনপ্রিয় দেবতা শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে লইয়া বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন, বিচিত্র সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহার সহিত আরণ্যক কোন দেবতার মিল বেশি বা কোন্ আরণ্যক দেবতা শ্রীকৃষ্ণে রূপান্তরিত—এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য। শুরু করিবার পূর্বে মাঝি 'রামদাস টুডু রেস্কার খেরোয়াল বংশাঃ ধরম পুথির ৪৭ সংখ্যক আলোচনার যথাযথ অনুবাদ দিতেছি ঃ

"সেই সময় কামরু আর ধামরু অনেক কষ্টে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। উঁহারা তখন দশবৎসরের। তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তাঁহারা চাএর নামক গ্রামে ভিক্ষা করিলেন। আর একদিন তাঁহারা চিরু নামক গ্রামে ভিক্ষা করিলেন। একদিন তাঁহারা নাগার গ্রামে ভিক্ষা করিলেন। এক দিন চাম্পা গ্রামে তাঁহারা ভিক্ষা করিলেন। একদিন দো নামক গ্রামে ভিক্ষা করিলেন। একদিন দুগ্ধা গ্রামে ভিক্ষা করিলেন। একদিন হের গ্রামে ভিক্ষা করিলেন। একদিন চারাই নামক গ্রামে ভিক্ষা করিলেন। একদিন মাওয়া নামক গ্রামে ভিক্ষা করিলেন। এই সমস্ত গ্রামে তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। একদিন ধামরু "চাম্পা" ও "গাড়" নামক গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। গ্রাম দুইটি অনেক বড় ছিল। ভিক্ষা করিতে অনেক বিলম্ব হওয়ায় প্রচণ্ড রৌদ্রে সে বাড়ি ফিরিতেছিল। সেই চাম্পা—গাড়ের পাশে একটি নদী আছে। তাহার

তীরে একটি কদম গাছ ছিল। সেই গাছের নীচে ধামু বসিয়া পড়িল। সেই পাহাড়ী নদীর নাম ছিল চাটি-ঝারি। মারাংবুরু সেই নদীর জলের স্রোত রোধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নীচে বাঁধ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাই সাঁওয়ার বাকড়া নামে অভিহিত। তাহার নীচে তিনি স্নান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাই 'তুপুন নাই' বা স্নানের নদীও বলা হইত। এই নদীটি লুগুবুরু ঝাণ্টা-বাড়ি হইতে প্রবাহিত। ইহার স্রোত পূর্ব দিকে প্রবহমান।

যাহা হউক সেই পাহাড়ী নদীর পাশে কদম্ববৃক্ষের নীচে ঘুম পাইলে ধামু ঘুমাইয়া পড়িলেন। আর সেই সময় এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলেন, কারাম গসাঁই তাঁহাকে বলিতেছেন—"বৎস ধামু, তুমি কদম্বকে স্থাপন কর। কদম্ব শাখে মাদল তৈয়ারি কর আর তিনবার প্রণাম করিয়া ইহার চারিদিকে নাচ। কদম গাছের সামান্য দূরে নদীর তীরে 'ধেনুগাই' আছে আর নদীর ধারে এক পাথরের 'চাঁই'-এর উপর একটা পাগড়ির কাপড় আছে। তাহারই পাশে বাঁশবনে একটা গাণ্ডিগ বাঁশি (বড় বাঁশি) আছে—তাহা লইয়া যাও।—আর যাহা তোমার প্রয়োজন হইবে আমি তোমাকে দিব। এই সোতার ধারে সিদ্ধেশ্বরের পূজা হেতু কদম গাছের ডাল রোপন কর।" এই প্রকার স্বপ্ন দেখিয়া তিনি জাগিয়া ধেনুটিকে দেখিতে পাইলেন এবং পাগড়ির কাপড়টিও দেখিতে পাইলেন। তাহার পর কদম্ববৃক্ষের চারিদিকে নাচিয়া কদমপাতায় মাদল তৈয়ারি করিলেন। ছোট একাট ডাল পুঁতিয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া নাচিলেন—তখন ধেনুটিও কাছে চলিয়া আসিল। ক্লান্ত ধামু সেই বাঁশঝাড় হইতে বাঁশি লইয়া আসিলেন। তারপর পাথরের উপর হইতে পাগড়ির কাপড় লইয়া মাথায় বাঁধিলেন। এক হাতে বাঁশি ধরিল আর ধেনু লইয়া বাড়ি ফিরিল।"

মাঝি রামদাস টুডু ডি. লিট. বর্ণিত কাহিনীর তুলনায় বর্তমান প্রচলিত কাহিনীগুলি কিছুটা পৃথক। বেলপাহাড়ীর নিকট বন্ধুবর রামেশ্বর সরেনের বাড়িতে প্রায় পনের বৎসর পূর্বে অতিথি ছিলাম। সেখানে এক বৃদ্ধ ধারু ও কারুর কাহিনী বলিয়াছিলেন। তাহা কতকটা মঙ্গলকাব্যের কাঠামোয় সাজানো। জমজ ভাই ধারু ও কারুর মধ্যে কারুই বড়। কারু কারাম গাছের ডাল পুঁতিয়া পূজা করে ধারু এ সব পছন্দ করেনা। ধারু একদিন পূজার কারাম ডাল দূরে ফেলে দিল। আর যায় কোথায়। দেখিতে দেখিতে ধারু ও কারুর পৈত্রিক সমস্ত সম্পদ নষ্ট হইয়া গেল। গরু মরিয়া গেল—চাষ হইল

না, ভীষণ দারিদ্র্য। ভিক্ষায় বাহির হইল। করম রাজার দেশে গিয়া কারু আবার করম ডাল আনিল। ধারু পূজা করিল। সম্পদ ফিরিয়া পাইল।

ধার্মু ও কার্মুর স্বরূপ

আসলে ধার্মু ও কার্মু এই দুই ব্যক্তিই ধর্ম ও কর্মের প্রতীক। ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম গোষ্ঠী কোল বা অসুর সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ দেবতার পূজা প্রথমে ছিল না। তাঁহারা ছিলেন প্রতীক-উপাসক। এই সম্প্রদায়গুলিতে মূর্তিপূজারও বিধান ছিল না। তাঁহারা বিভিন্ন বস্তুতে করুণাময় ঈশ্বরের বা বোঙ্গার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই সমস্ত বোঙ্গা বা অশরীরী শক্তি সর্বদাই ক্রিয়া করিতেছে। এমনিভাবে পথের যে আত্মা বা শক্তি তাহাই ডাহার-বোঙ্গা, ঘরের যে আত্মা বা শক্তি তাহা অড়া-বোঙ্গা। সমস্ত দেশই বঙ্গাময় বা বঙ্গা-দিশম্। আমরা বস্তু-জগতে যাহা দেখি তাহা সেই শক্তিরই বিকাশ মাত্র। আবার তাঁহারা গুণ বা ক্রিয়ার আরাধনা কবিতেন। সেই সমস্ত গুণ বা ক্রিয়াতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া প্রতীকের মাধ্যমে তাঁহাব উপাসনা করিতেন। ধরম ও করম ঠাকুর মানুষের ধর্ম ও কর্মের ব্যক্তিত্ব রূপ (Personified)। কিন্তু অশরীরী আত্মা যখন পূজা গ্রহণ করিবেন তখন কাহাকে আশ্রয় করিয়া পূজা গ্রহণ করিবেন? তাহারই জন্য প্রয়োজন হইল প্রস্তর খণ্ডের। বিভিন্ন প্রস্তর খণ্ড নানা বিচিত্র বোঙ্গা বা শক্তির আধাররূপে গৃহীত হইল। কোন সমাজে বৃক্ষও বোঙ্গা বা শক্তির আশ্রয় হিসেবে গৃহীত। লোকালয় হইতে কিছুটা দূরে অতি প্রাচীন বৃক্ষে বা বৃক্ষের তলায় ঐ শুভ বা অশুভ শক্তিগুলি বাস করিতে থাকে।

কার্মু অর্থাৎ করম ঠাকুর বা করম রাজা ধর্মু অর্থাৎ ধরম ঠাকুব বা ধরম রাজা কোল বা অসুর গোষ্ঠীর পুরাতন দেবতা, সিঞ বোঙ্গা-মারাং বুরু-লিটাবুরু প্রভৃতির মতই।

মানুষ আপনার উন্নতির জন্য আরো কিছু কিছু শক্তিকে পূজা শুরু করে। তাঁহাদের মধ্যে ধার্মু ও কার্মু প্রধান। মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধর্ম ও কর্মের বিশেষ স্থান। ধর্ম অর্থাৎ বিবেকবান আদর্শ জীবনের সহিত কর্ম অর্থাৎ কর্মময় জীবনের জয়যাত্রা। মানুষের জীবনে এই প্রধান গুণ ধর্ম ও

কর্ম প্রতীক উপাসনার ক্ষেত্রে দেবতায় উন্নীত হইলেন। এই দুই ক্রিয়ার বোঙ্গা বা শক্তি হিসেবে এই দুই দেবতাকে আরাধনার প্রয়োজন হইল। পণ্ডিতদের মতে গীতার শুরুতে যে ধর্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ আছে তাহা জীবন-সংগ্রামের ধর্ম ও কর্মক্ষেত্র এছাড়া কিছুই নয়। কুরু "কৃ" শব্দ জাত "কৃ" শব্দের স্বরভক্তির প্রকাশ মাত্র। এবং বাঙলার বাহিরে প্রায় সর্বত্র 'ঋ' ধ্বনি 'রু' ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। যেমন ঋণ=রুণ, অমৃত=অম্রুত=অম্রুতাঞ্জন। কাজেই কুরুক্ষেত্র মূলত কর্মক্ষেত্র।

মানুষের জীবনে ধর্ম ও কর্ম এই দুই গুণ ধামু ও কামু এই দুই শক্তি বা দেবতায় রূপান্তরিত। আর এই সত্যটিকে সমাজজীবনে দেবতার মহিমায় প্রতিষ্ঠার জন্য ধারু ও কারু এই দুই মানব সন্তানের পরিকল্পনা। এই প্রবন্ধের শুরুতেই খেরোয়াল বংশাঃ ধরম পুঁথির সরাসরি অনুবাদ দেওয়া আছে। সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, খেড়িয়া, ভূমিজ, চেরো প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে করম পূজার প্রচলন আছে। কোল বা অসুর গোষ্ঠীর বাহিরে মারাংবুরুর কোন প্রাধান্য নাই। কিন্তু করম রাজার প্রাধান্য সর্বত্র। অরণ্য জীবনের এই করম ও ধরম দেবতা অরণ্যের বাহিরে আজিও জীবন্ত।

ধরম দেবতা ও বৌদ্ধধর্ম

ভগবান বুদ্ধ তাঁহার ধর্মের মূল উপাদানসমূহের মোটা অংশ কোল বা অসুর গোষ্ঠীর সমাজ হইতে গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মের মূল চাবিকাঠি জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস। ইহা কোল বা অসুর গোষ্ঠীরও ধর্মীয় চিন্তার গোড়ার কথা। কিছু সাঁওতালী উপকথা জাতকের কোনো কাহিনীর সহিত একেবারে মিলেয়া যায়। পাপের জন্য মানুষ জীবজন্তু গরু ভেড়া হিসাবে যাহাকে ঠকায় তাহার সেবার জন্য ফিরিয়া আসে—এই রকম উপকথা সাঁওতাল সমাজে বিস্তর আছে। আবার জাতিস্মর জীব বা মানুষের গল্পও আছে। গীতায় বর্ণিত আত্মার পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ পূর্বক নতুন বস্ত্র ধারণকে ইহা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু বুদ্ধের নির্বাণ লাভের কাহিনীর সঙ্গে অসুর গোষ্ঠীর মৃত্যু-ধারণার সম্পর্ক আছে। যাঁহারা মুক্তি লাভ করে তাঁহারাই ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হন—তাঁহারাই "বোঙ্গা-আকান্"। বাঙালিরা যে প্রয়াত না বলিয়া মৃত আত্মীয়কে স্বর্গত

বা ঈশ্বর বলেন এইখানেই তাহার তাৎপর্য। অপর পক্ষে ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের কোনো আভাস কোল গোষ্ঠীর মধ্যে নাই। জাতিভেদ প্রথা, ভগবানকে ডাকিবার জন্য ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের ব্যবস্থা কোল সমাজে নাই। পরে ব্রাহ্মণের অনুকরণে কিছু কিছু উপজাতি (ব্রাহ্মণ=বাহুহন=) পাহান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

ভগবান বুদ্ধ দীর্ঘকাল ছোটনাগপুর অঞ্চলে কাটাইয়াছিলেন। এক কথায় বৌদ্ধ ধর্মের সহিত কোল গোষ্ঠীর ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার সম্পর্ক আছে। বেদ ও ব্রাহ্মণবিরোধী বৌদ্ধধর্মের বহু কিছু যাযাবর (বেদ-বীন, বর্তমান নাম যাযাবর অর্থ) আচারবিরুদ্ধ।

ধর্মঠাকুর ও সূর্যদেবতা

বৌদ্ধধর্মের প্রধান শিক্ষা ধর্মং স্মরনং গচ্ছামি—জীবনের আদর্শ বা ধর্মকে রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইব—কোলগোষ্ঠীর নিকট প্রধান আকর্ষণীয় ছিল। ধর্মই ধামুর্ দেবতা পরবর্তী কালে ধর্মচেতনায় রূপান্তরিত। রাঢ় বাংলায় যে ধর্ম-ঠাকুরের এত প্রাধান্য তাহার প্রধান কারণ কোল গোষ্ঠীর বহু মানুষই ধর্ম বা ধামুর্কে লইয়া হিন্দু সমাজ গঠন করে। এবং পাল যুগে বাংলায় যখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে তখন ধর্মের ধারণা স্থায়ী আসন লাভ করে। মনে হয় বৌদ্ধ-ধর্মের প্লাবনের যুগে বেদ ব্রাহ্মণ বিরোধী কোল বা অসুর সভ্যতার মানুষ এই ধর্মের দ্বারা আন্দোলিত হয়। এই গোষ্ঠীর প্রধান দেবতা সিঞ্‌বোঙা বা সূর্য-দেবতার সহিত ধর্মকে অভিন্ন কল্পনা করা হইল। অসুর গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন উপজাতি যুয়াঙরা সূর্য ঠাকুর ও ধুর্ম ঠাকুরকে একাকার করিয়া ফেলিয়াছে। কেওনঝর জেলায় যুয়াঙপীড় পাহাড়শ্রেণীর বহু গ্রামে একই গাছের তলায় সূর্য দেবতা (তাহাদের ভাষায় 'বেড়া') ও ধরমদেবতাকে অভিন্নভাবে পূজা করা হয়। ধর্ম ঠাকুরের পূজা করিলেও প্রথা ও নিয়ম শৃঙ্খলা সূর্যদেবতাকে আশ্রয় করিয়া। সূর্য যখন প্রবল শক্তিসম্পন্ন হইয়া বিষুব রেখার দিকে চলিয়া আসে অমনি ধর্মের উৎসব শুরু হয়।

করম ঠাকুর ও কর্মবাদ

কামুর্ বা করম ঠাকুর কর্মের প্রতীক—আদিবাসী অনেক সমাজে করম রাজা।

ব্রাহ্মণ্যশাসিত হিন্দু সমাজে এই করম রাজাই কর্মবীর শ্রীকৃষ্ণ। অনেকে করম পূজাকে কৃষিভিত্তিক পূজা বলিয়া মনে করেন। ভাদ্র মাসে করম (কদম-Adina cordifoba) ডাল বন হইতে আনিয়া তাহা পুঁতিয়া পূজা করিতে হয়। করমকে যদি কৃষ্ণই ধরা হয় তাহা হইলেও কৃষ্ণ শব্দের মৌলিক অর্থ কিষাণ বা কৃষক। বুদ্ধের মতো কৃষ্ণও ঐতিহাসিক। কিন্তু বুদ্ধের (ধামুর) তুলনায় কৃষ্ণ (কামু) সম্বন্ধে ধারণা কোল গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে প্রাচীনতর। তাহা ছাড়া কৃষ্ণকে কোল বা অসুর গোষ্ঠীর মানুষ আত্মীয় মনে করেন। কৃষ্ণ ছিলেন কংসাসুরের ভাগিনেয়। অসুর শব্দের অর্থ নেতা বা দেবতা। ঋগ্বেদে এই অর্থেই গৃহীত। কৃষ্ণের পোশাক ও বাল্যলীলার আচরণে কোল গোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষিত হয়। আড় বাঁশি, গরু চরানো, গায়ের রঙ, পালকের চূড়া সব কিছুই ছোটনাগপুর অঞ্চলের রাখালদের মনে করাইয়া দেয়। মূল কৃষ্ণ যে এই রকম ছিলেন তাহা নহে। তবে শ্রীকৃষ্ণের ধারণায় কোলদের জনপ্রিয় লৌকিক এই ধারণাটি মিশিয়া গিয়াছে।

এই করম দেবতার পূজা আদিবাসী সমাজে খুবই পুরাতন, মনে হয় কৃষির সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে। মাঝি রামদাস টুডু মহাশয়ের খেরোয়াল বংশাঃ ধরম-পুথির ৭২ পৃষ্ঠায় একটি চমৎকার চিত্র আছে। একটি নদীর তীরে কদম গাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছেন করাম গসাঁই আর তাঁহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দন জানাইতেছেন ধামু। সেই করম গসাঁই দেখিতে কৃষ্ণের মতো। আবার ভগবান বুদ্ধের ধম্মপদ এবং শ্রীকৃষ্ণের গীতার মধ্যে একটি আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। এগুলি সংকলিত হওয়ার বহু পূর্বে এই দুই দর্শনের বিকাশ যে পাশাপাশি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

করাম গসাঁইকে লইয়া যে করম গান, তাহাকে বৈষ্ণব পদাবলী বলা যাইতে পারে। বিশাল ঝাড়খন্ড অঞ্চলে এমনিভাবে কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

ঝাড়খন্ড অঞ্চলে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা বাড়ে মহাপ্রভুর আগমনের পর। মহাপ্রভুও পরম তৃপ্তির সহিত এই অঞ্চলে প্রেমবাণী প্রচার করেন।

শুন ভট্টাচার্য আমি ভ্রমিনু বহুদেশ।
বনপথের সুখের সম নাহি লব লেশ॥

কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বহু কৃপা কৈল।
বনপথে আনি মোরে এত সুখ দিল॥

চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ প্রভাব "গৌরাঙ্গিয়া গীত" রাঁচি ও পাঁচপরগনিয়া অঞ্চলে খুবই বিখ্যাত।

শরৎচন্দ্র রায় The Mundas and their Country পুস্তকে মুণ্ডাভাষার যে সমস্ত করম গানের বিবরণ দিয়াছেন সেগুলি মূলত বৈষ্ণব পদাবলী। নৃতাত্ত্বিক নির্মলকুমার বসুর মতে শ্রীচৈতন্যের আগমনের ফলে রাঁচির মুণ্ডারা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলী করম গান হিসাবে বিবেচিত হয়। ইহার কারণ আর কিছু নয়—কারাম ঠাকুর ও শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা বহু পূর্ব হইতে একাকার করিয়া রাখিয়াছিলেন।

"Some Karam songs sung by the Sonepur Mundas who have forgotten even the name of Vaisnavism, appear to have been composed at a time when the influence of Vaisnav teachings had died out but the memory remained."

করম গানের দৃষ্টান্ত ঃ

যমুনাগাডা জাপা বুরু গিতল কদম সুবা
তিরি রি-রি রুতু সারিতানা
মাঁদ্ সাকাম চোবারেরা
সাবান হাইকো ঞিরতানা।
করাকমদ দুয়াররে দুবকানা
লাঁদাতানা রে॥

অর্থাৎ

যমুনা নদীর কূলে বালির পাহাড়ে বাঁশের বাঁশি রি-রি করিয়া বাজিতেছে। বাঁশপাতা মাছ, (এক রকম পাতলা মাছ) চ্যাং মাছ, মাগুর প্রভৃতি মাছ আনন্দে ছুটাছুটি করিতেছে। আর কাঁকড়া তার গর্তে বসিয়া দেখিতেছে। গানটির মধ্যে বাউলদের গানের মত কিছুটা হেঁয়ালি আছে।

বৈষ্ণব প্রভাবের ফলে করম পূজার এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। কোল বা অসুর সমাজে বিভিন্ন পূজায় ছোট মোরগ বলি দেওয়া হয়। কিন্তু করম পূজায় বৈষ্ণব প্রভাব আসায় কোনো কোনো স্থানে বলি বন্ধ হইল। কোথাও কোথাও রক্তপাত বন্ধ করিয়া বলির ব্যবস্থা হইল। করম দেবতার নিকট পশু পক্ষীর গলা টিপিয়া মারিয়া মৃতদেহ উৎসর্গ করা হয়।

এইভাবে কোল বা অসুর গোষ্ঠীর এক প্রধান দেবতা, কংসাসুরের ভাগিনেয়, জরাসন্ধের কুটুম্ব কৃষ্ণ 'কৃ' বা কর্মের প্রতীক হিসাবে পূজা পাইলেন। মূলত 'কৃ' বা কর্ম মানেই প্রধান কর্ম কৃষি-কর্ম। শুধু তাই নয়, কর্মী মানেই কৃষিকর্মী। মহামাত বা মাহাতো সম্প্রদায়ের একাংশ কৃষি-কর্মের জন্য কুরমী (বা কর্মী নামেই পরিচিত), মহারাষ্ট্রের 'কুনবি' সম্প্রদায়ের নাম শব্দ এই একই উৎস হইতে আসিয়াছে—তাহারা মূলত কৃষক সম্প্রদায়ের। আর কৃষ্-ধাতু ণক্ প্রত্যয় করিয়া কৃষ্ণ শব্দের আগমন। সাধারণ ব্যাকরণ অনুসারে আমরা জানি কৃষ্ণগঞ্জ কিষানগঞ্জে পরিণত হয়। সংস্কৃত পণ্ডিতরা কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যা এই রকম করিয়াছেন।

কৃষিভূর্ বাচকঃ শব্দঃ ণশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ।
তয়ো রৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভি ধীয়তে ॥

এই প্রসঙ্গে মনে করা ভালো, কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার বলা হয়। আবার মতান্তরে বলরামই অষ্টম অবতার। বলরামের আয়ুধ ছিল হল—অর্থাৎ কৃষির সরঞ্জাম লাঙ্গল। মনে হয় কৃষ্ণ-বলরাম একই সঙ্গে কিষাণ-বলরামকেই বুঝাইত। আসলে বলরামই অষ্টম অবতার। কৃষ্ণ তাঁহার পরিচায়ক শব্দ, এবং পরবর্তী কালে তাহাই প্রচলিত হয়।

কৃষ্ণ অসুর গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন এবং ভারত সভ্যতার মূল সত্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে উদ্যোগী ছিলেন। আপন স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাসী কোল বা অসুর গোষ্ঠীর নেতাগণ আপন আপন প্রাধান্য রক্ষায় ব্যস্ত হন আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আত্মীয় জানিয়াও তাঁহাকে হত্যা করেন। কৃষ্ণ সমগ্র জীবনে কোল গোষ্ঠীর যে সমস্ত নেতাকে হত্যা করেন তাহার মধ্যে পূতানা, কংস, পঞ্চজন দৈত্য, জরাসন্ধ, কাল যবন, শিশুপাল, শৃগাল, বানাসুর, হংসডিম্বক, নরকাসুর, নিকুম্ভ, কৌণ্ডক অন্যতম। ইহাদের অনেকেই তাঁহার আত্মীয়। কিন্তু তাহার ফল স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে শহিদ হইতে হইয়াছিল। তাঁহারই সম্প্রদায়ের জরাব্যাধ তীরদ্বারা কৃষ্ণকে হত্যা করিয়াছিল। কৃষ্ণ-প্রেমিকগণ এই হত্যাকাণ্ডকে জরাব্যাধের মৃগভ্রমে কৃষ্ণহত্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ সৎকার বা সরানোর ব্যবস্থা কেহ করে নাই। "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাব্যাধের শরাঘাতে দেহ ত্যাগ করিলে তাঁহার শবদেহ সেই

বৃক্ষমূলে পতিত থাকে। পরে কোনো মহাপুরুষ সেই দেহাস্থি সংগ্রহ করেন; অনন্তর তাহা ইন্দ্রদ্যুম্নের হস্তগত হইলে তিনি তাহাতে জগন্নাথের মূর্তি নির্মা-নার্থ বিশ্বকর্মাকে নিযুক্ত করেন।" (সুবল মিত্র)

যাহাই হউক অসুর বা কোল গোষ্ঠীর কোনো সম্প্রদায়ই কৃষ্ণ ও বুদ্ধের সরা-সরি পূজা করে নাই। ইহার প্রধান কারণ অসুর গোষ্ঠীর মানুষ প্রতীক-উপাসনা করিতেন। তাই তাহারা ধর্মের পূজা করিতেন পাথরের নুড়ির মাধ্যমে আর কর্মের পূজা করিতেন কদম গাছের ডালের মাধ্যমে। বুদ্ধ ও কৃষ্ণ এইভাবে প্রতীকের সঙ্গে একাকার হইয়া গেলেন।

উপজাতিদের প্রতি গ্রামে দেখা যায় কিছুটা নির্জনে অতি পুরাতন শাল গাছের তলায় কিছু বড় পাথরের চাঁই পড়িয়া থাকে। তাহা গ্রামের মঙ্গলার্থী বোঙ্গার আবাসস্থল। তাহাকে গরাম বা গরাম থান (গ্রাম) বলা হয়। মনে হয় শালগাছের তলায় যে গ্রাম শিলা তাহাই তাহাদের শাল গ্রাম শিলা।

ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজে পুরোহিতদ্বারা প্রবাহিত হতে পারে (Portable) এমন নুড়িকে শাল-গ্রাম-শিলা বলিলেও তাহার পবিত্রতা ও যাদু-পরিবেশ (magic-atmosphere)-এর জন্য চক্র চিহ্নিত শিলার প্রয়োজন হয়। এই শিলা একটি সামুদ্রিক জীবের ফসিল মাত্র। কার্বোনেট অব লাইম-এর ফসিলাইজড্ অ্যামোনাইট্স্। মূলত এর নাম ছিল বজ্রকীট! হিমালয় সংলগ্ন গভীর নদীর তীরে শালগ্রাম নামক গ্রামে এই জাতীয় শিলা পাওয়া যায় সর্বাধিক। পুরোহিত ও বৈষ্ণবরা এইভাবে শাল-গাছের তলায় গ্রাম শিলাকে দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলিলেন। (Of a village situated on the river Gandaki and regarded as sacred by the vaishnavas its name comes from the Sal trees growing near.)-Sir Monier-williams.

শেষ কথা

যাহাই হউক ছোটনাগপুর অঞ্চলে বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় গ্রাম শিলাকে ধরম-করম (ধ+ক) ও আরো নানান্ শক্তি ও বোঙ্গার প্রতীকরূপে শালগাছের তলায় পূজা করিতেন ও এখনও করেন। তাহাই ব্রাহ্মণ্যশাসিত হিন্দু সমাজে স্থায়ী আসন লাভ করিল।

সোনারায়ের পালা

অজয়কুমার চক্রবর্তী

আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে সোনারায়ের গান। সোনারায় ঠাকুর—ব্যাঘ্র-ভালুকের দেবতা। সোনারায় দক্ষিণরায়ের স্বগোত্রীয়। সোনারায়ের পূজা আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ী মহকুমার ধুবড়ী এবং গোলকগঞ্জ থানায় অধিক প্রচলিত। এই পূজা হয় পৌষ সংক্রান্তিতে। কিন্তু পহেলা পৌষ হইতে সংক্রান্তির পূর্বদিন পর্যন্ত চলে 'দক্ষিণা' সংগ্রহের পালা। দক্ষিণা সংগ্রহের প্রণালী হইতেছে—গৃহস্থের বাড়ি গিয়া দান গ্রহণ করা। দক্ষিণা সংগ্রহ করে গ্রামের ছেলের দল। খোল, করতাল সংযোগে ছেলেরা গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি গিয়া সোনারায়ের গান শুনাইয়া ঝোলা ভর্তি করিয়া দক্ষিণা সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। দক্ষিণার উপচার হইতেছে—চাল ধান নগদ কড়ি।

সোনারায় ব্যাঘ্রদেবতা। তাই সোনারায়ের গানে আমরা গাই—

দাদা বলরাম রে হাসিয়া কতা কয়
দুঃশসনী বাঘনিয়া নামিল সোনারায়।
বাঘ নামিল রে চিতিয়া পাখেরা
ভোর বিয়ানে বাঘ মানুষ কামেরা
পংখী উরিয়া যায় রে তার জোর পায় নেপুর
বাশী বাজায় গান করে সোনারায় ঠাকুর।

এই হইল ব্যাঘ্র দেবতার রূপ। দেবতার পূজারও দরকার। প্রত্যেক পূজার বিধি রহিয়াছে—সোনারায়েরও আছে। পূজা করিতে হইলে উপচার, অর্থের প্রয়োজন—তাই উপচার অর্থ সংগ্রহ হয়। গৃহস্থের বাড়ি গিয়া বলা হয়—

সোনারায়র দক্ষিণা নাপেপূর্ণ কুলা ধান
তাহার উপুরা নাপে জোর গুয়া পান।

উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা দেবতাকে পূজা; দেবতাকে যাহাতে হেয় প্রতিপন্ন করা না হয় তজ্জন্য বলা হয়—

ধানের কাঙালী না হই গয়া তো না চাই
দ্যাশের ব্যবহার কতা কয়া দিয়া যাই।

প্রতি গৃহস্থের দক্ষিণা দেওয়া উচিত, যদি কোন গৃহস্থ দক্ষিণা বা দান না দেন তবে তাহাকে শাপান্ত করিবার কথাও আছে—

সোনারায়র দক্ষিণা দিতে যায় করিবে হেলা
তারা ভাতারক নাগাল পামু গরু চরাবার বেলা।
সোনারায়র দক্ষিণা দিতে যায় করিবে হেলা
হাত পাও খসিয়া পরে চক্ষুর বিরায় ঢেলা।

আবার যাঁহারা ঠাকুরের দক্ষিণা দেন তাঁহাদিগকে শুভেচ্ছা জানাবার রীতি রহিয়াছে—

সত্যঠাকুর সোনারায় গাইরস্তক দে তুই বর
ধনে বংশে বাড়ুক পিরি চন্দ্র দিবাংকর।
পইলে বাড়ুক গাইগরু বাড়ুক ধান
দেওয়ানে দরবারে পাউক বাটাভরা পান।
গইলে বাড়ুক গাইররু জাঙালে বাড়ুক নাউ
গিরির ঘরের শত্তুর দুষমন বনের বাঘে খাউক।

উদ্ভব

আলোচ্য অনুচ্ছেদে সোনারায় ঠাকুরের উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। সোনারায় ঠাকুরের মাতা হইতেছেন গোয়ালিনী এবং পিতা ধর্ম ঠাকুর—

আঁশি ধর গোয়াল বন্দং মথুরা নগরে
যে আটকুরার পুত্র নাই সেই গোয়ালের ঘরে।

পুত্রহীনা নারীর জীবন বিষময়। তাঁহাকে নিত্য বহু গঞ্জনা সহিতে হয়—

আটকুরা বলিযা দধি কেহই নেয় তা তাক
আহারে দধির ভাত ফেলায়
পিকিড়া পয্যন্ত দধি নাই খায়।

এই লজ্জা অপবাদের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার মানসে সেই গোয়ালিনী ঠাকুরের নিকট পুত্রবর প্রার্থণা করিলেন—

কালী প্রভাতে যাঞা পুত্রবর নেওং

তারপর সেই গোলালিনী নদীর তীরে উপস্থিত হইল,

কন্যা ছান করে হে নদীর গণে ঢেউ
এত বেলা ছান করে কোন গৃহস্থবউ।

স্নানান্তে পূজার ব্যবস্থা করিল,

চন্দন পিষিয়া কন্যা ভড়াইল কুরি
** ** **
আলো আতর বা কাঞা কলা কদমের ফুল
শত শত নিল ফুল শোলার ভূপল।
** * * *
তিল তুলসী ফুল আরোও বেল পাত
ধূপ চিনি গুর কলা নৈবিদ্যের ঠাট।

উপাচার সাজাইয়া সেই নারী,

পূর্ব মুখে রহিল কন্যা ধরম চিন্তিয়া।
* * * * ׀ * *
যদি হে ধর্ম ঠাকুর না দিস পুত্র বব
স্ত্রীবধ্য হইম মুই কাটারীর করিম ভড়।

তখন ধর্মঠাকুর উপস্থিত হইলেন,

সাক্ষাতে আসিল ধর্ম নারীর গোচরে
নারীর নিকটে ধর্ম কহে মৃদুভাষে,
না করিহ আত্মহত্যা তোকে দিনু বর।

বরলাভ করিয়া নারী,

বর পায়া গোয়ালের নারী বাসরে চলিল
অমৃতকদম্ব ফল ভক্ষণ করিল।
উঞা গাছে থাকি ঠাকুর ছারিল নিশ্বাস
শ্বেত মাছি হয়া ঠাকুর গর্ভে নিল বাস।

ধর্মঠাকুরের পূজায় যে ছাগকে বলি দেওয়া হয় সেই ছাগকে ধর্মের নামে পূর্বাহ্ণেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটে নাই,

ধবল অংশ পাঠা কইতর দিলেন ছাড়িয়া

অবশেষে দশমাস দশদিন পর ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইলেন—

এইরূপে দশমাস দশদিন পূর্ণিত হইল
মায়ের কূপী হইতে ঠাকুর ভূমিতে পড়িল।

* *　　* *　　* *

গোয়ালের ঘরে জন্ম হইল ঠাকুর সোনা রায়।

সোনারায় ঠাকুর ক্রমে ক্রমে বড় হইতে লাগিলেন—গৃহস্থের আচরণীয় সর্ব-প্রকার ক্রিয়াকলাপ করা হইল। সোনারায় ঠাকুর বড় হইয়া—

বাতানেতে রান্ধে বাড়ে বাতানেতে খায়
মহিষের পৃষ্ঠে চাড়িয়া যাদু শিঙা বেণু বাজায়।
কেহ বান্ধে কেহ ছান্দে কেহ দোয়ায় দুধ
দুধ ছেকিয়া ভান্ড ভড়ায় উমুরা দুই বাপপুত।

এ যেন শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার সামিল।

তারপর—

যাদুয়ার মায়ে ডাকেরে জননী ডাকেরে
আইজ নিশি পোহাইল কার বাসরে।

শ্রীরাধিকাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মথুরা লীলার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

শ্রীকৃষ্ণের ননী চুরির অনুরূপ কাহিনী সোনারায়-এর মধ্যে পাই,

শিকিয়াতে থুইছে ভান্ড লাস্য নাহি পায়
পিরার উপর পিরা থুইয়া উর্দ্ধমুখে চায়।
তলেতে ছেঁদিয়া ভান্ড হেটে দিল মুখ
হেনকালে দেখা হইল যশোদা মায়ের মুখ।

এইখানে সোনারায়ের গোয়ালিনীমাতা একেবারে শ্রীকৃষ্ণের মাতা শ্রীমতী যশোদায় পরিণত হইল।

তারপর দেখি সোনারায় একেবারে 'কানাই' হইয়া গেছেন—

রৌদ্রেতে বান্ধিয়া থুইছে এ সুন্দর কানাই।

পিতা ধর্মঠাকুর হইয়া পাড়লেন নন্দ গোপ—

তখনে নাকইছং নন্দ বেছেয়া ফেলাও ধেনু
সহরে মাগিয়া খাবো কোলে নিয়া কানু।

এই কানুই 'কালিয়াদহের' কানু—

যেই ছাওয়ালে খেলা খেলাইছে সেই ছাওয়ালে কয়

তোমার যাদুক দেখছি আমরা সেই কালীদয়।
হাতে আছে মোহন বাঁশী মাথায় মটুক চুল।
নাচিতে নাচিতে গেইছে সেই কালীদহের কুল।

কানাই-এর ভাই বলাই--

ধ্যায়ানে কানাই বলাই তখন ধ্যায়ানে বসিল
বাছুর সুদে গাভী তখনে আপনে আসিল।

এ যেন শ্রীকৃষ্ণ বলরাম-এর কথা।

সোনারায় ঠাকুর মোগল কর্তৃক ধৃত হইয়া বন্দী হন। বন্দীশালার কার্যকলাপে মহাদেবের ছাপ পরিস্ফুট। কারণ শ্রীকৃষ্ণ ভাঙ্‌গাঁজা খাইতেন না। খাইতেন মহাদেব—

কতেক রাইত হইতে ঠাকুরের কতেক রাইত যায়
কতেক রাইত যাইতে ঠাকুরের ভাঙধুতুরা খায়।

পদকর্তা বাণীকণ্ঠের 'শ্রীকৃষ্ণ চরিত' কাব্যে পাই শ্রীকৃষ্ণ ভ্রাতা বলরাম নেশা করিতেছেন।

যাব না গোঠে মা যাব না গোঠে
রাখিতে নারিব ধেনু বলাই দাদার হঠে।
সব দিগে যাএ মাগো সভাকার ধেনু
আমারে বলেন দাদা আন পিএ কানু।
অনেক যতনে ধেনু বাহুড়িয়ে আনি
আমারে বলেন দাদা যোগাহ বারুণী।
বারুণী খাইএ দাদা আপনা পাসরে
মুষল তুলিএ ধাএ মারিবার তরে।

সোনারায়ের ভাঙ্‌ধুতুরা খাওয়ার কোন সঠিক ইঙ্গিত পাওয়া যায় না সত্য। তবে সূর্যমঙ্গল গানে আমরা পাই সূর্যঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গের কারণ হইতেছে—

উত্তর আলা কদম গাছটি দক্ষিণ আলা বাওরে
গা তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মাওরে।

অবশেষে সূর্যাইর নিদ্রাভঙ্গ হইলে দুপুরে পুষ্করণীতে স্নান করিলেন। ধুতি গামছার কথা ভাবিতে হইল না; কারণ—

স্বর্গে আছে তাতীর ছাওয়াল
সুর্যই ধুতি গামছা যোগায় সেওরে।

তারপর জলপানের ব্যবস্থা—

শিবাই ঠাকুর যাত্রা করে দুইকানে ধুতুরা
ষোলশত গোপিনী লয়ে চলিছে মথুরা।

সুর্য্যই শিব হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মত ষোলশত গোপিনী লইয়া চলিলেন। হয়ত এইভাবে সোনারায় ভাঙ্‌ধুতুরা খাইয়াছেন।

'রামবধ' পালায় দেখি 'যাদুয়া' বা কানাই রাম হইয়া গেছেন অথচ এই পালায় যশোদার উল্লেখ রহিয়াছে। এই রাম 'রাম' নহে, এ হইতেছে আদরের ডাকের 'যাদুরামের' 'রাম'।

সোনারায়ের উদ্ভব কাহিনীর মধ্যে বহু জট পাকাইয়া গিয়াছে। সোনারায় ধর্মরায়ের পুত্র।

মঙ্গলসাহিত্যে পাই প্রথমে কিছুই ছিল না, এক অনন্ত মহাশূন্যের অস্তিত্ব মাত্র ছিল—

নহি রেক নহি রূপ নহি বন্ন চিন
রবি শশী নহি ছিল নহি রাতি দিন।
নহি ছিল জলথল নহি ছিল আকাশ
মেরুমন্দার ন ছিল ন ছিল কইলাস।
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল।
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর
বম্ভা বিস্টু নছিল নছিল আঁবর। (শূন্যপুরাণ)

এই মহাশূন্যে আশ্রয় করিয়া মহাশূন্যে ভ্রমণ করিতে করিতে "পরভু" সৃষ্টিবাসনা জাগিয়া উঠিল,

মহাশূন্য মধ্যে পরভুর জনমেল পবন
তাহা হইতে জনমিল অনিল দুইজন।

অনিল হইতে বুদ্বুদের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রভু আসনস্থ হইয়া বসিলেন কিন্তু বুদ্বুদে ভার সহিতে না পারিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। কিন্তু

'পরভু' সৃষ্টি রক্ষার জন্য নিজ কায়া সৃষ্টি করিলেন—তিনিই নিরঞ্জন—ধর্মঠাকুর।

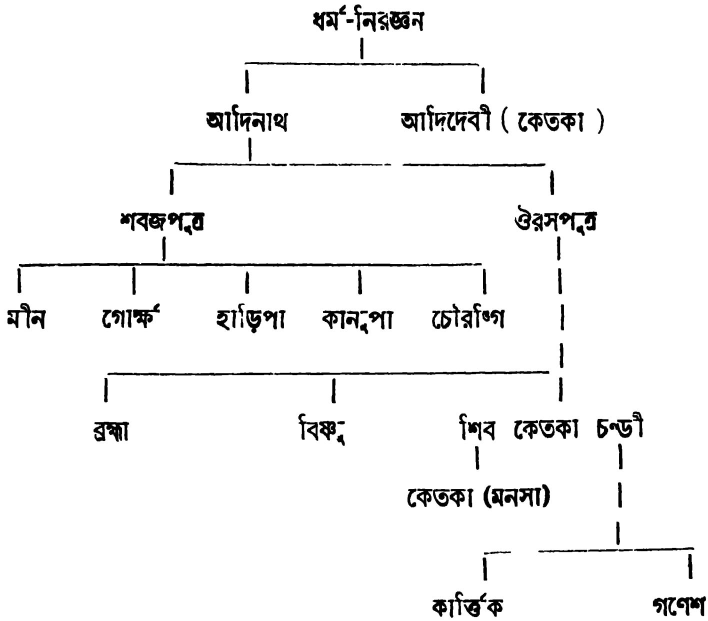
তপস্যারত ধর্মঠাকুরের হাই হইতে উল্লুকের জন্ম। উল্লুকের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া আবার তপস্যায় মগ্ন হইলেন...উল্লুক ভার সহিতে পারিতেছে না—'পরভু' মুখামৃত হইতে জলের সৃষ্টি করিলেন—উল্লুক জলে ভাসিতে লাগিল। তবুও উল্লুক ভার বহিতে অশক্ত। উল্লুকের বীরপাখা হইতে পরমহংসের জন্ম হইল। প্রভু হংসারূঢ় হইলেন—কিন্তু হংসও অক্ষম। কূর্মও পরিশেষে ভার বহিতে অক্ষম হইয়া পলায়ন করিল। তখন ধর্মেব কনক পৈতা হইতে বাসুকির সৃষ্টি হইল। প্রভু বাসুকির আহারের জন্য ভেকেব সৃষ্টি করিলেন। ধর্মঠাকুর তাঁহাব গলাব ময়লা বাসুকির মস্তকে বাখিলেন—সেই হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। পৃথিবীব আকার দিনেব পবদিন বর্ধিত হইতে লাগিল, ধর্মঠাকুর পৃথিবীর শেষপ্রান্ত খুঁজিতে গিযা ঘর্মাক্ত হইযা পড়িলেন, সেই ঘর্ম হইতে আদ্যাশক্তিব জন্ম হইল।

আদ্যাশক্তিকে গৃহে রাখিয়া প্রভু বল্লুকা নদী সৃষ্টি করিযা নদীর তীবে ধ্যানমগ্ন হইলেন। চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। আদ্যাশক্তি যৌবনে পদার্পণ করিলেন। কামদেবের সৃষ্টি হইল। কামদেবের দৌলতে ধর্মের তপস্যা ভঙ্গ হইল। ধর্মরাজ গৃহে ফিরিলেন, আদ্যা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন—বিবাহ দিতে হইবে। পাত্রের খোঁজে বাহির হইলেন। বাহির হইবার পূর্বে ধর্ম দুইটি পৃথক পাত্রে মধু ও বিষ রাখিয়া গেলেন। আদ্যা যৌবনের ভারে অসহ্য হইয়া বিষ পান করিলেন, কিন্তু না মরিয়া হইলেন গর্ভবতী। এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব জন্মগ্রহণ করিলেন।

পুত্রগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য নিরঞ্জন দুর্গন্ধ শবরূপে ভাসিতে ভাসিতে আসিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু দুর্গন্ধের চোটে পলাইলেন। শিব ধ্যানে পিতাকে চিনিতে পারিয়া জানুর উপর রাখিয়া দাহ করিলেন। এই শব হইতে শবজ পুত্র জন্মলাভ করিল।

হাড়েতে হাড়িপা হৈন কর্ণেতে কানুপা
মস্তক ফুটিয়া গোর্ক্ষ পালান্য উড়িয়া।
চরণে চৌরঙ্গি নাথের হইল জনম
নাভিপদ্ম হৈতে হৈন মীনের জনম।

নিম্নে বংশলতা দেওয়া হইল—



ধর্মের পুত্র সোনারায়—তাহার কোন হদিস ধর্মপুরাণ হইতে পাওয়া যায় না।

আবার দেখি সোনারায় (যাদুরাম) মহিষ তাড়াইতেছেন।

মহিষ তাড়া করিলে সোনারায় ঠাকুর বেসামাল হইয়া পড়িলেন এবং মৃতবৎ মনে করিয়া দাহের ব্যবস্থা করিলেন—

হরি হরি বলিয়া রামক 'অগ্নি ভেজাইল'।

কিন্তু 'মরিয়াও নামরে রামের' মত সোনারায়ের কিছুই হইল না—

পোড়াত না যায় রাম মুখে গায় গীত
বাঘের পিঠে চড়িয়া রাম মইষের খায় দুধ।

এ কাহিনীই বা কোথা হইতে আসিল। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের একটি শাখার কারবার লৌকিক দেবতা লইয়া। কিন্তু সোনারায়ের কোন আলোচনা এযাবৎ হয় নাই। অপিচ সোনারায়ের কাহিনীর মত জট পাকানো কাহিনীও মঙ্গল কাব্যে খুব কমই আছে।

মহিষ চড়ানোর ইতিহাসে এইটুকুই শুধু নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সোনারায় গো-মহিষ একই সঙ্গে চড়াইতেন। গো-মহিষ গৃহপালিত পশু। কিন্তু আদতে সোনারায় ব্যাঘ্রের দেবতা।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্যাঘ্র পূজার প্রচলন ছিল। মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত শিবলিঙ্গের সহিত ব্যাঘ্রাকৃতি মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। শিবের আসন ব্যাঘ্র-চর্মের উপর এবং পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে সম্ভবত ব্যাঘ্রই শিবের প্রাচীনতম বাহন ছিল। শিব নেশাখোর ছিলেন। সোনারায়ও বন্দীশালায় 'ভাঙ ধুতুরা' খাইয়াছেন। এই সোনারায় কি সেই শিবের প্রতিবিম্ব? শিব যেমন বেল পাতাতেই তুষ্ট সোনারায় তেমনি অল্পেতে তুষ্ট।

সোনারায় বেদোক্ত দেবতা নহেন লৌকিক দেব্তা। বেদে সেই জন্য সোনা-রায়ের উল্লেখ নাই। বেদে গৃহপালিত পশুর এক দেবতার নাম পাই—"পূষণ", পূষণ (পুং) পূষতীতি পূষ-বৃধৌ স্বেন্ উক্ষণ্প্লীহন্নীতি। উণ্ ১। ১৫৮) ইতি কনিন প্রত্যায়ান্তে নিপাত্যতে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণেও পূষণের উল্লেখ রহিয়াছে—

আদিত্যং ভাস্করং ভানুং সবিতারং দিবাকরং

পূষানমর্য্যমাণঞ্চ স্বর্ভানুং দীপ্তদীধিতিম্।

(১০৯। ৬৪ মাঃ পুঃ)

এই সূর্য দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে একজন। মহাভারতে দ্বাদশাদিত্যের নাম কথন স্থানে নবম আদিত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে—

ধাতা মিত্রোহর্যমা শক্রো বরুণ স্ত্বংশ এবচ

ভগো বিবস্বান্ পূষাচ সবিতা দশমস্তথা।

(মহাভারত ১। ৬৫। ১৫-১৬)

"চারি বেদেই পূষার স্তুতি আছে। ধাতুগত অর্থ ধরিলে পূষা অর্থাৎ পোষক বা পরিপালক।"

তৈত্তরীয় সংহিতার মতে "পূষা বা ইন্দ্রিয়স্য বীর্য্যস্য প্রদাতা" ২।২।১।৪

এইরূপে পূষা বেদের কোথাও পশুদিগের পোষক ও পরিবর্ধক, কোথাও মানবের সম্পত্তি-পোষক, কোথাও তিনি গো-তাড়ন দণ্ডহস্তে গোপাল, কোথাও ছাগবাহন। কোথাও তিনি সূর্যদেবরূপে নিখিল জগৎ পরিদর্শন করিতেছেন।"

সোনারায় ও পুষণের মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য আছে কি? এক দেখিতেছি—

সোনারায় গৃহপালিত পশু রক্ষা করেন এবং পুষণও "গো-তাড়ন দণ্ডহস্তে গোপাল"।

মনসা, শীতলা প্রভৃতি দেবীদের মূর্তি দিয়া পূজা করা হয় কিন্তু সোনারায় ঠাকুরের পূজায় কোন মূর্তি নাই। এক বংশদণ্ড কয়েকটি সোনার ফুল এবং পাটের আশ চামর আকারে (অতি ক্ষুদ্র) লইয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরানো হয়। অথচ গীতের মধ্যে সোনারায়কে বংশীধারী বলা হইয়াছে—

"হাতে বাঁশী লইয়া.........

এবং এই ঠাকুরের বাসস্থল বৈকুণ্ঠে—

বৈকুণ্ঠের ঠাকুর নামিল ঘোড়াঘাট।

বৈকুণ্ঠে বাস করেন—লক্ষ্মীনারায়ণ তথা বিষ্ণু। লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ পরমথতঃ এক তথাপি ভাবনায় ভিন্ন। চৈতন্য সম্প্রদায়ের মতে রাধাকৃষ্ণ গোলক-বিহারী। কিন্তু ভগবৎবৈষ্ণবের ভাবনায় লক্ষ্মীনারায়ণ বৈকুণ্ঠবিহারী। পদাবলী সাহিত্যে কানু বা কৃষ্ণই হইতেছেন বিষ্ণুর রূপান্তর। তবে কি বিষ্ণু কৃষ্ণ সোনারায় হইয়াছে?

উপসংহার

সোনারায় ঠাকুরের লিখিত কোন পালা পাওয়া যায় নাই। গায়েনদের মুখে মুখেই চলিতেছে। তাহার ফলে স্থানে স্থানে পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

বঙ্গদেশেও বিশেষত উত্তরবঙ্গ এবং পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে সোনারায়ের গান রহিয়াছে।

বাদাবনের লৌকিক পালাগান

মানিক সরকার

বাদাবন বা সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বনবিবির গান হ'য়ে থাকে। একে 'বোনবিবির কেরামতি' অর্থাৎ 'বোনবিবির জহুরা নামা' বা 'ধোনা মোলে দুখের পালা' বলা হয়। এটি একটি লৌকিক পালাগান। বাদাবনের বনবিবি বাংলার লৌকিক দেবী। ইনি সুন্দরবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। হিন্দু মুসলমান উভয়ের কাছে ইনি পূজিতা। ভক্তদের কাছে তিনি 'অবতার', তিনি গরীবের 'মা জননী', তিনি 'জগতের মাতা'। মানুষকে দেবরূপে অথবা দেবতাকে মানুষরূপে অনুকরণ করে চিত্রিত করার ইতিহাস বহু প্রাচীন। এতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়। বনবিবি এমনই একটি চরিত্র। বাংলার ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোককবিরা এই চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি এমনই একটি চরিত্র যাঁকে সকল ধর্মাবলম্বীর শ্রমজীবী নরনারীরা 'মা' বলে সম্বোধন করেন। যিনি প্রকৃত মমতাময়ী তিনিই মা।

পালাগানে বনবিবির আবির্ভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

আদম জাতের পরে আল্লা নেঘেবান।
আলেমল গায়ে তিনি রহিম ও রহমান ॥
বোনবিবি সাজংলিকে ভেজে দুনিয়াতে
হুকুম হইল যাও আঠার ভাটিতে ॥

বনবিবি ও সাজংগলি দুজনে ভাই বোন। তারা বেহেস্তে ছিল। আল্লাতালার হুকুমে মক্কা শরীয়াতের বেরাহিম ফকিরের ঔরসে এবং গুলাল বিবির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। বেরাহিম ফকিরের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর নাম ফুলবিবি। তিনি 'আটকুঁড়ে' ছিলেন। তাঁর সন্তান হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সন্তানের কামনায় আল্লাতালার ইচ্ছায় বেরাহিম ফকির দ্বিতীয়বার জলিল ফকিরের কন্যা গুলাল বিবিকে বিবাহ করেন।

বেরাহিম ফকির ফুলবিবির কারসাজিতে গর্ভবতী গুলাল বিবিকে বনের

মধ্যে নির্বাসন দেন। গুলাল বিবির নির্জন বনবাসে বনবিবি ও সাজংগলি 'একগর্ভ' থেকে 'তাওল্লাদ' হয়। মাতা গুলাল বিবি বনের মধ্যে বনবিবিকে রেখে সাজংগলিকে নিয়ে অন্যত্র চলে যান। অসহায় বনবিবিকে বনের হরিণেরাই লালন পালন করতে থাকে।

পরবর্তীকালে বেরাহিম ফকিরের সঙ্গে গুলাল বিবির মিলন হয়, বনবিবির সঙ্গে সাজংগলির সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎকারের পরে মা এবং বাবাকে লক্ষ্য করে বনবিবি বলেন ঃ

বাদাবনে যাব মোরা হুকুম আল্লার।
সে কারণে পয়দা হইনু ঘরেতে তোমার ।।

মদিনা থেকে ভাই-বোনে বাদাবনের উদ্দেশে যাত্রা করল।

মদিনা শহর হইতে যায় নিকালিয়া।
কতদিনে হিন্দুস্থানে পেঁছিল যাইয়া ।।
গঙ্গানদী পার হইয়া দেল খোসালীতে।
দোহে গাও গাও চলে বলিতে হাসিতে ।।
পেঁছিল ভাঙ্গড় সাহা আছিল যেথায়।
বোনবিবি সাজংগলিকে তামিজে বসায় ।।

ভাঙ্গড় সাহার নিকট তাঁরা আঠার ভাটির পরিচয় নিলেন। ভাঙ্গর সাহা বললেন :

নামেতে দক্ষিণরায় ঈশ্বর ভাটির।
এ সব জঙ্গল জান তাহার জায়গীর ।।
দুসমন খাড়ি জুড়ে বহুত আছয়।
বসেছে মধুর হাট যেথায় সেথায় ।।
যাইয়া এ সব তুলে ডাল পহেলাতে।
দখল হইবে দেশ জানিবে দেলেতে ।।
চান্দাখালি রায়মঙ্গল শিবদাহ আর।
প্রথমে এ সব ঠাই কর এক্তিয়ার ।।

প্রসঙ্গত সংগৃহীত 'কালু ও গাজীর গীতে' দক্ষিণরায়ের অন্য একটি পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

আঠারভাটির দেশ ভ্রমণের শেষে।
আসিলেন তারা ব্রাহ্মণা নগরে ॥
সে দেশে মটুক রাজার দক্ষিণা রায় গোঁসাই।
তার সমান বীর এ জগতে নাই ॥
চারটা মহিষ আর চাউল তিন মন।
প্রতি প্রভাত সন্ধ্যায় তিনি করেন ভক্ষণ ॥

ভাটির দেশের সকল বৃত্তান্ত জেনে নিয়ে বনবিবি এবং সাজংগলি বাদাবনে উপস্থিত হ'লেন। আরম্ভ হল দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বিরোধ। যুদ্ধ বেধে যাবার ঠিক প্রাক্কালে "দক্ষিণরায়ের মাতা নারায়ণী" দক্ষিণরায়কে যুদ্ধে না পাঠিয়ে নিজেই গেলেন। বনবিবি সাজংগলির সঙ্গে নারায়ণীর যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। হাতাহাতি যুদ্ধ শেষ হলে "নারায়ণী ডরে পাও ধরিল বিবির" এবং বনবিবিকে স্বীকার করে নিয়ে তিনি বললেন, "বাদাবন হইল এবে তোমার এক্তিয়ার"। নারায়ণী বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বনবিবি "ভাটিশ্বরী" হলেন। ভাটিশ্বরী হয়েই তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

কদাচন মনে কারো দুঃক্ষু নাহি দিব।
সীমানা করিয়া বাদা বাটিয়া লইব।

তিনি দক্ষিণরায়কে মোম মধুর কেন্দ্র কোদাখালি এবং অন্যান্য প্রধানদের বাদাবন ভাগ বাঁটোয়ারা করে সীমানা বেঁধে দিলেন। তাঁর মোকাম ভুরকুন্ডুতে এবং দক্ষিণে এড়োজোল পর্যন্ত তাঁর সীমানা হ'ল। তিনি ভবানীপুর, রাজপুর বিয়াড়ি, মাখালগাছা, আসড়ি, ময়নাডাঙ্গা, হাসনাবাদ, পাটলিগ্রাম, কাটাখালি প্রভৃতি স্থানে গেলেন। একে পালাগানের কাহিনীর প্রথম অংশ বলা যেতে পারে।

পালা কাহিনীর দ্বিতীয় অংশ ধোনা বা মোনা বা ধোনাই মোনাই দুঃখের কাহিনী। ধোনাই ও মোনাই দুই ভাই বনের মোম মধু সংগ্রহ করে প্রভূত টাকা পয়সার মালিক হয়ে উঠেছে। মোম মধু সংগ্রহের জন্য তারা সপ্তডিঙা প্রস্তুত করল। কিন্তু প্রস্তুত হবার পর তাদের একজন লোক কম পড়ল। গ্রামে এক দরিদ্র বিধবা ছিল। তার দুখে নামে একমাত্র পুত্রসন্তান ছিল। দুখেকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখিয়ে ধোনা তাকে নিয়ে এল। সপ্তডিঙা যাত্রা করল। কিন্তু বনে গিয়ে আর মধু পায় না। বাদাবনে মোম মধু সৃজন করেন দক্ষিণরায়।

তারই হুকুমে মধু উধাও হয়ে গেছে। ধোনা নিরাশ হয়ে পড়ল। ভক্তের এই অবস্থা দেখে দক্ষিণরায় স্বপ্নে ধোনাকে বললেন, 'নরবলি পূজা খেতে বাসনা আমার'। তিনি ধোনাকে আরও বললেন ঃ

নরবলি পূজা যদি দিতে পার তুমি।
মোম মধু সাত ডিঙা দিব তোরে আমি ॥

ধন দৌলতের লোভে ধনবান ধোনা দুখেকেই বলি দেওয়ার ব্যবস্থা করল। বর্ণনাটি এইরূপ ঃ

এই কাজের তরে মোরে নায়ে এনেছিলে
দুখের জান গেল তুমি ধনবান হইলে ॥
আর কেন ফজিহত কর বার বার।
দুখেকে খাইলে বাঘে পরওয়া কি তোমার ॥
দুখে বলে চাচাজিগো ছালাম চরণে।
বল কাঠ ভাঙিবার যাব কোন বনে ॥
ঈশারা করিয়া ধোনা বন দেখাইল।
দুঃখ মনে দুখে নাও হইতে নামিল ॥
গেল দুখে কোদোখালির চর পার হইয়া।
ধোনা ডিঙা খুলে গেল দুখেকে রাখিয়া ॥
কহিতে লাগিল ধোনা মুখে আপনার।
দুখেকে দিলাম রায় লহ একবার ॥

বনের মধ্য থেকে কাঠ সংগ্রহ করে এনে দুখে দেখল "ধোনা মেলে গেছে নাও লিয়া।" ধনের লোভের জন্য কি প্রতারণা! নদীর চরে দুখেকে নিঃসঙ্গ দেখতে পেয়ে "রায়মণি" আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়ল। নরমাংস ভক্ষণের আশায় দক্ষিণরায় ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করে "আনন্দে দুখেকে খাইতে যায় মনের অহ্লাদে।"

এই দক্ষিণরায়ের জন্ম বৃত্তান্ত পালাগানে নিম্নরূপে বর্ণিত হ'য়েছে ঃ

দেও জাত ছিল এক দন্ড বক্ষ নামে।
পন্ডিত আছিল সেই আপন কওমে ॥
হিন্দুগণ মুনিঠাকুর কহিত তাহারে।
কেন না বিদ্যান ছিল হরেক প্রকারে ॥

বাদাবনে এসে থানা করে আপনার।
নারায়ণী নামে এক জরু ছিল তার ।।
বাদাবনে বুজরগানে জাহের করিল।
সব বাদাবন তার দখল হইল ।।
দেও দান ভূতপ্রেত ডাকিনী বিস্তর।
পিশাচ সায়ত্রিশ কোটি ছেপাই লস্কর ।।
জংগলের বিচে তার রাজত্ব হইল।
নারায়ণী দেওনী এক পুত্র প্রসবিল ।।
রাখিল দক্ষিণরায় নাম তনয়ের।
জবরদস্ত হইল বড় আওলাদ দেওয়ের ।।
দন্ড বক্ষ মুনি মেলে পুত্র রাজ্য পাইল।
দক্ষিণরায়ের নাম প্রকাশ হইল ।।
হিন্দুতে দিইত পূজা দেবতা বলিয়া।
অত্যাচার করে যায় মানুষ ধরিয়া ।।
বাদাবনে মানুষের দেখা যদি পায়।
বাঘের ছুরত হইয়া পাক্যাড়িয়া খায় ।।
রাক্ষসের জাত মানুষ খাইতে লাগিল।
কেহ তার প্রতিকার করিতে নারিল ।।

মোম মধু পাওয়ার প্রতিদানে ধনবান ধোনা কর্তৃক দক্ষিণরায়কে দিয়ে যাওয়া দরিদ্র দুখে দেখতে পেল ঃ

চরে থেকে দুখে হেথা পাইল দেখিতে।
বাঘ হইয়া আসে রায় আমাকে খাইতে ।।
প্রকান্ড শরীর আর দুস উর্ধ্বে তুলে।
হাওয়া ভার আসে সেই বাঘ গাল ভরে ।।
দেখিয়া দুখের গেল পরান উড়িয়া।
বলে বোনবিবি মাগো লেহ উদ্ধারিয়া ।।

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া দুখেকে উদ্ধার করবার জন্য বনবিবি সাজংগলিকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁদের তাড়া খেয়ে দক্ষিণরায় বড় গাজি খানের নিকট উপস্থিত হলেন। দক্ষিণরায়ের ভাষায় ঃ

কহিল দক্ষিণারায় শুন গাজি ভাই,
বারজহাটিতে ঘর নামেতে ধোনার।
সাত ডিংগা লিয়া আইল সরহদ্দ আমার ।।
মোম মধু দিনু আমি খাতেরে তাহার।
দুখে নামে একজন নায়ে তার ছিল।
তাহাতে খাইতে মোর খাহেস হইল ।।
কেদোখালি চরে ধোনা দিল সে দুখেরে।
খোসালিতে হৈয়া তারে গেনু খাইবারে ।।
এক লাড়কা এক লাড়কি কোথা হইতে আইল।
দুখের তরে তে মোরে খাইতে না দিল ।।
লাড়কির রূপের কথা কি কহিব আর।
জঙ্গল হয়েছে আলো ছুরতে তাহার।।

দক্ষিণরায়কে পিছু তাড়া করতে করতে বনবিবি ও সাজংগলি বড় গাজিখাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। গাজির অনুরোধে বনবিবি দক্ষিণরায়কে মার্জনা করলেন। দক্ষিণরায় বনবিবির নিকট নতি স্বীকার করলে বনবিবি তাঁকেও সন্তানরূপে গ্রহণ করলেন। বনবিবি বললেন ঃ

কহে বিবি এক বেটা দুখে ছিল মোর।
তাহার দুখেতে আমি আছিনু কাতর ।।
এখন যে তিন বেটা হইল আমার।
আমার যে দুখে বেটা গরীব লাচার ।।
দুখের উপরে এবে মোহর করিয়া।
মেল তিন ভায়ে এবে গলায় ধরিয়া ।।
রায় আর গাজি মেলে দুখের সহিত।
ভাই বলে কোলে তুলে লইল ত্বরিত ।।

বনবিবির আশীর্বাদে দক্ষিণরায় এবং বড় গাজির সহায়তায় কুমিরের পিঠে চড়ে দুখে তার গ্রামে পেঁছায়। সেখানে গিয়ে বড় গাজিখাঁর রক্ষিত গুপ্তধন লাভ করে বহু ধনরত্নের মালিক হয়ে ওঠে। ধোনার নিজ পাপকর্মের শাস্তি স্বরূপ তার মেয়ের সংগে দুখের বিবাহ দেয়। মা জননী বনবিবির কৃপায় দুখে বাদাবনে সুখে শান্তিতে দিন কাটায়। গরীব দুখে চৌধুরী হয়ে ওঠে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

দুখের রাজত্বে প্রজা থাকে আরামেতে।
বিনা খাজনায় বাস করে গরীবেতে ॥
তাবেদার হইল যতেক জমিদার।
ফাজেল মৌলভি করেন বিচার ॥
রায়েত প্রজার করে হক আদালত।
তাকত না ছিল কার করে হেমাকত ॥
আদালত করে দুখে তক্তে দিয়ে বার।
সকলেতে রাজি রহে তজবিজে তাহার ॥
দেওয়ান মুচ্ছুদি যাছ আর ছিল যত।
কেহ বৈসে কেহ খাড়া মোরতবের মত ॥
সকলেতে রাজু থাকে যার যে কামেতে।
হুকুমের এস্তেজার রহে সকলেতে ॥
হাসমত দবদবা খুব দুখের হইল।
যে কেহ দুসমন ছিল ডরে ডরাইল ॥

সমগ্র পালাটির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্যনীয়—পালাটির ঘটনাস্থল আঠারভাটি বা বাদাবন। পালাতে সুন্দরবনের নাম অনুল্লিখিত। তাই মনে-হয় সুন্দরবন নামাঙ্কিত হবার পূর্বে এ পালার সূচনা-অংকুর হয়েছিল। পালা সূচনা হবার সময়ে বাদাবনের প্রধান আকর্ষণ ছিল মোম মধু এবং কাঠ। কৃষির কাজ তখন হয়তো ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়নি। দক্ষিণরায় মোম মধু সৃজন করতেন। নরবলির দ্বারা দক্ষিণরায়কে সন্তুষ্ট বিধান করেই মোম মধু সংগ্রহ করতে হ'ত।

উল্লেখ্য ঃ নরবলি পূজা যতক্ষণ নাহি দিবে।
মোম মধু নাহি দিব এ কিন জানিবে ॥

দক্ষিণরায়েরও একটি পরিচয় এ কাহিনীতে আছে, তিনি দন্ডবক্ষ মুনির পুত্র। তাঁর মাতার নাম নারায়ণী। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজা হন, "জঙ্গলের বিচেতার রাজত্ব হইল।" ডাকিনী, যোগিনী, কালভূত, দেড় লক্ষ সোমার, সাঁইত্রিশ কোটি কুহকি সেপাই লস্কর তাঁর ছিল। তাঁর অস্ত্রের মধ্যে ছিল সটচক্র, গদাচক্র, ধর্মচক্র বাণ, শেল ইত্যাদি। আর ছিল বনের বাঘ, জলের কুমির, হাঙ্গর প্রভৃতি।

দক্ষিণরায় "অত্যাচার করে যায় মানুষ ধরিয়া," "বাদাবনে মানুষের দেখা যদি পায়। বাঘের ছুরত হইয়া পাকাড়িয়া খায়॥" এই রাক্ষসের জাতকে কেউই প্রতিরোধ করতে পারছিল না।

রাক্ষসের জাত মানুষ খাইতে লাগিল।
কেহ তার প্রতিকার করিতে নারিল॥

তাই আল্লার হুকুমে সাজংগলি এবং বনবিবি আঠারভাটিতে আবিভূর্ত হ'লেন। তাঁরা বাদাবনে উপস্থিত হ'লে তাঁদের রূপে "বন হয়েছে উজলা।" কিন্তু দক্ষিণরায় বলে উঠলেন ঃ

বলে মেরা বাদাবনে নেড়ে আইল কি কারণে
যবনেরে দেহ ভাগাইয়া।
দেও দানা ভূত যারা মেরা তাবেদার তারা
ডেকে আন যাইব লড়িতে।

অর্থাৎ দক্ষিণরায়ের পরবর্তী সময়ের আবিভূর্ত শক্তি বনবিবি। নারায়ণী কাহিনী, দক্ষিণরায়ের কাহিনী, বড় গাজিখাঁর কাহিনী ধোনা মোনা এবং দুখের কাহিনী এবং বনবিবি সাজংগলির কাহিনী মুখে মুখে প্রচারিত। এই বিক্ষিপ্ত কাহিনীগুলি যুক্ত হয়ে একটি পালাগান রূপে পূর্ণতা লাভ করেছে। মনে হয় এক সময়ে কাহিনীগুলি স্বতন্ত্রভাবে ছিল। স্বতন্ত্র এবং প্রক্ষিপ্ত কাহিনীগুলি পরবর্তীকালে একত্রে গ্রথিত হয়ে বনবিবির পালায় উন্নীত হয়েছে। সমগ্র পালায় বনবিবি মাতৃরূপা, ভক্তবৎসলা, করুণাময়ী এবং দয়াবতী। তিনি কখনই উগ্র ভয়াবহ এবং হিংস্র নন।

মদিনায় একই গর্ভে, একই ঔরসে পুরুষ সাজংগলি এবং নারী বনবিবি আবিভূর্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পালাটির নাম সাজংগলি না হ'য়ে বনবিবি হয়েছে। পালাতে মূল শক্তি বনবিবি, সাজংগলি তার সহায়ক শক্তি মাত্র। উভয়ে ভাই-বোন বলে চিহ্নিত হয়েছে।

কাহিনীতে দুটি মৌলিক শক্তির দ্বন্দ্ব আছে, একদিকে বারজহাটির ধনবান ধোনা-মোনা, বিপরীতে বিধবার দরিদ্র সন্তান দুখে। মধ্যযুগের ধনী বনাম দারিদ্রের সংঘাত এখানে আছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় ধোনা-মোনা দক্ষিণরায়ের ভক্ত, বনবিবির ভক্ত দুখে। ধনবান ধোনামোলে দক্ষিণরায়কে নরবলি পূজা দিয়ে তার হুকুমে সাত ডিঙা মোম মধু সংগ্রহ করে দেশে ফিরল। কিন্তু বাঘরূপী

দক্ষিণ রায়ের গ্রাস থেকে বনবিবি দুখেকেই রক্ষা করলেন। শুধু দুখেকেই রক্ষা করলেন না, প্রতারক ধোনাকেও শাস্তি দিলেন, তাঁরই হুকুমে ধোনা দুখেকে তার কন্যার স্বামীরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ল।

কাহিনীর মধ্যে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বড়গাজিখাঁর কোনরূপ বিরোধের চিত্র নেই। পরন্তু বনবিবি এবং সাজংলির তাড়া খেয়ে দক্ষিণ রায় "ভাঙ্গরে পোঁছিল গিয়া নজদিগে গাজির।" গাজিও বলেন, "নামেতে দাক্ষণ রায় বন্ধু যে আমার।" ধর্মীয় সমন্বয়ের চিত্র এটি।

কাহিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতাও নন কিংবা কৃষির দেবতাও নন, তিনি "মোম মধু সৃজনকারী" ধোনা-মোনা নামক ধনবান মৌলেদের দেবতা, এই লৌকিক দেবতা বাদাবনে চাষবাসের অনেক আগের দেবতা। অরণ্য-দেবতা তিনি এবং বনবিবি ধনবানদের ধন উপার্জনের সহায়ক দরিদ্র দুখেদের মাতৃ দেবী। তাই "কহে বিবি এক বেটা দুখে ছিল মোর। তাহার দুঃখেতে আমি আছিনু কাতর।।" কারণ, "দুখে বেটা গরীব লাছার।।" বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের চরিত্র দুর্লভ, লোকসাহিত্যের গৌবব।

সমগ্র পালাগানটিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ কাহিনীর সূচনা, বনবিবি ও সাজংলির জন্মবৃত্তান্ত, গুলালবিবির সঙ্গে বেরাহিম ফকিরের বিবাহ, গুলালবিবির বনবাস, বাপ-মায়ের নিকট থেকে বিদায় হয়ে মদিনা শরিফে সুরিদ হাত যাবার কাহিনী, বনবিবি বা সাজংলির মদিনা থেকে আসবার বৃত্তান্ত, ভাটি দেশে আগমন, ভাটি দেশে নারায়ণীর সঙ্গে যুদ্ধ, বনবিবির জয়লাভ ও নারায়ণীর আনুগত্য স্বীকার, বাদাবনে মোম মধু সংগ্রহের জন্য ধোনা মৌলের যাত্রা, ধোনামৌলে কর্তৃক দুখেকে দক্ষিণ রায়ের নিকট সমর্পণ, বনবিবি কর্তৃক দুখে উদ্ধার, বড়গাজিখাঁর নিকটে বনবিবি ও দক্ষিণ রায়ের উপস্থিতি, ধোনামৌলের আপনগ্রামে প্রত্যাবর্তন, পুত্রহারা দুখে মাতার শোক, বনবিবির কৃপায় দুখের দুঃখের অবসান বিবাহ ও সুখ শান্তিতে বসবাস।

উল্লেখ্য নারী চরিত্র পাঁচটি, যথা—ফুলবিবি, গুলালবিবি, নারায়ণী, দুখের মা এবং বনবিবি; পুরুষ চরিত্র নটি, যথা—বেরহাম ফকির, সাজংলি, দক্ষিণ-রায়, ধোনা মোনা দুখে, সনাতন, ভাঙ্গর সা; ছেকেন্দার বাদসার পুত্র বড় গাজি-খাঁ এবং গ্রামবাসী, কর্মচারিগণ ও সৈন্যসামন্ত। পশুচরিত্র হরিণ, বাঘ, কুমির হাঙ্গর ইত্যাদি। কাহিনীর ঘটনাস্থল মদিনা এবং বাদাবন।

আলোচ্য পালার রচয়িতা মোহাম্মদ মুনসী। লেখক পরিচিতিতে আছে ঃ

কহে মোহাম্মদ মুনসী জনাবে সবার।
ভুরসুট কানপুরে বসতি আমার।।
ছেজদা শোকর মেরা দরগায় খোদার।
খায়ের করিল আল্লা এবাতে আমার।।

মুনসী বয়নদ্দী রচিত পালাগানও আছে। আলোচ্য পালাটি ১৩০৫ সালের ১২ই ফাল্গুন রচিত হয় বলে উল্লেখ আছে। গানের ভণিতায় আরও নাম আছে, হীন আছিরদ্দিন, অধম ছাদেক মুনসী, মুনসী মোহম্মদ প্রমুখ।

বনবিবি সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে, 'বনদুর্গা, বনচণ্ডী, বনষষ্ঠী বা বিশালাক্ষী কালক্রমে ইসলাম ধর্মের প্রাধান্যকালে বনবিবি হ'য়েছেন', মতান্তরে বনবিবি 'হিন্দু মুসলমানের লৌকিক ধর্মচিন্তার সমন্বিত বা মিলিত অরণ্য দেবী', আবার কেউ কেউ বলেন, বনবিবি 'আদি পাঠান যুগের কোন মুসলমান সাধিকা ও ইসলাম ধর্ম প্রচারিকা অভিজাত মহিলা ছিলেন।' শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের মতে 'বনবিবি যে আদিতে বনদেবী তা বর্তমানের মূর্তি ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে ধরা পড়ে। এখনও এর আকৃতিতে ও বেশভূষায় অরণ্য বৈশিষ্ট্য একেবারে লোপ পায়নি'। (বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১০)। এর মূর্তি "অতি সুশ্রী, পৌরাণিক দেবীদের মতোই লাবণ্যময়ী, বালক সন্তানকে কোলে নিয়েও বনবিবির মূর্তি দেখা যায়" (ঐ)।

সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে বনবিবির পূজা এখনও অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত খাড়ী (মৌজা—৪৯) গ্রামটি একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম হিসাবে খ্যাত ছিল। উহা বর্তমানে মথুরাপুর থানার অধীনে একটি সামান্য পল্লীরূপে চিহ্নিত। অথচ প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে খ্রীস্টীয় দশম—একাদশ শতাব্দীতে রচিত ডাকর্ণব নামক একখানি পুঁথিতে বৌদ্ধতান্ত্রিকদের চৌষট্টিটি পীঠস্থানের মধ্যে একটি পীটস্থানরূপে উহার নাম দেখা যায়। এছাড়া মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনেও উহার উল্লেখ আছে।

তাম্রশাসনের "উক্তলিপি পাঠে জানা যায় যে বঙ্গদেশ সেন রাজগণের শাসনকালে (খ্রীস্টীয় ১২শ শতাব্দী) উহা তৎকালীন শাসন বিভাগ পৌন্ড্রবর্ধন ভুক্তির মধ্যে খাড়ী মণ্ডলের সদর স্থান ছিল এবং উহার অধীন মণ্ডল গ্রামে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন ব্যাসদেব শর্মা নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন।.....

"গ্রামে একটি বৃহৎ পুষ্করণীর দক্ষিণপূর্ব পাড়ে বড়খাগাজীর আস্তানাটি অবস্থিত। ……এই ঘরের মধ্যে মাথায় পাগড়ী বাঁধা, মুখে চাপদাড়ী, পায়ে জুতো এবং দক্ষিণহস্ত উর্ধ্বে তুলিয়া যোদ্ধাবেশী অশ্বারোহী বড়খাঁগাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটি মনুষ্য প্রমাণ হইবে। ইহা ভিন্ন ঘরের পশ্চিম ধারে একটি বেদীর উপর মাটির ছোট ছোট সাতটি স্তূপ আছে; ইহা বিবিমার স্থান এবং ছোট ছোট আরও অনেকগুলি গাজী সাহেব ও বিবিমার মৃন্ময় শলন মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি মূর্তির দক্ষিণ হস্তে ধৃত পতাকা শোভা পাইতেছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেবলমাত্র একটি হরিণ বাহন বিবিমার শলন মূর্ত।…

"উল্লিখিত পুষ্করিণীর দক্ষিণ পশ্চিম পাডে বড়খাঁগাজীর আস্তানার অনুরূপ একটি ঘরে নারায়ণী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে একটি বাঁধান বেদীর উপর সিংহবাহিনী, চতুর্ভুজা, ত্রিনয়নী নারায়ণী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, দেবী বস্ত্র ও অলংকারে সজ্জিতা। এই একই বেদীর উপর বড়খাঁ-গাজীর মূর্তি, প্রায় দুইফুট উচ্চ একটি প্রস্তর স্তম্ভ ও নারাষণ শীলা আছে। ইহা ভিন্ন মন্দির ঘরেব মধ্যে আরও অনেকগুলি গাজীর শলন মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। নারায়ণী মন্দিরটিও প্রাচীন।"

(পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৩৯—৪১)

"রায়দীঘি রাস্তার পাশে চক্রতীর্থের নিকটে কালীনগরে একটি মাইবিবির বাজার আছে। বাজারের পূর্বে ওই স্থানে মাইবিবির নির্দিষ্ট স্থান ছিল। তারই জন্য বাজারটির নাম 'মাইবিবির বাজার' হয়েছে। বাজারের মধ্যে চারিদিক বারান্দাযুক্ত পূবমুখী একটি ঘরে মাইবিবির দ্বিভুজা বিশাল মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবী ডান পা ঝুলাইয়া এবং বাম পা মুড়িয়া ডান পায়ের হাঁটুর উপর তোলা অবস্থায় উপবিষ্টা। পাযে জুতো, মাথায় মুকুট ও বস্ত্র পরিহিতা। ইহা ভিন্ন এই ঘরে কোলে শিশু সহ দেবীর মৃন্ময় শলন মূর্তি আছে।…মাইবিবির নিত্য পূজা হয়, তবে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার বিশেষ পূজা এবং অগ্রহায়ণ—পৌষ মাসে মাগন পূজা উপলক্ষে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু লোকজনের সমাগম হইয়া থাকে। স্থানীয় বাগ পরিবার দেবীর সেবায়েত এবং পার্শ্ববর্তী খাড়ী গ্রামের মুসলমান ফকিরেরা পূজাদি দিয়া থাকেন। প্রধানতঃ কলেরা ও বসন্ত রোগের জন্যই মাইবিবির নিকট মানত

দেওয়া হয়" (ঐ, পৃঃ ২৩৮)

"কুলটীকরী গ্রামে সাধারণ একটি ঘরে বিবিমা ও বরখাঁগাজির পূজা হইয়া থাকে। এই গ্রামের বিবিমা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং জাগ্রত দেবী বলিয়া কিংবদন্তি আছে।

"প্রতি মাসের অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের মঙ্গলবার হইতে চৈত্র মাসের বারুণীতিথি পর্যন্ত প্রতি শনি মঙ্গলবার বিবিমা ও বড়খাঁগাজির বিশেষ হাজত পূজা ও উৎসব হইয়া থাকে এবং বারুণীতিথিতে পূজা ও পুণ্যস্নানের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। বিভিন্ন গ্রাম হতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিশ সহস্র নরনারী উৎসবে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন স্থান হইতে কীর্তনীয়ার দল প্রতি শনি মঙ্গলবার উৎসব প্রাঙ্গণে কীর্তনগান করিয়া থাকেন। আতপ-চাল সহ ফল মিষ্টির নৈবেদ্য এবং তুলসীপাতা ও বিশেষ করিয়া মোরগজবা ফুল দিয়া বিবিমার নিকট পূজা দেওয়া হয়। মানত স্বরূপ কেহ কেহ ধুনা পোড়াইয়া থাকেন এবং কেহ কেহ নির্দিষ্ট পুকুরে স্নান করিয়া দন্ডী কাটেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি বিবিবা ও বড়খাঁগাজির খাদেমরূপে পূজাদি দিয়া থাকেন। শোনা যায় বহুকাল পূর্বে পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক হিন্দু বিবিমার সেবায়েত ছিলেন" (ঐ, পৃঃ ২২৩—২৪)।

প্রতিবৎসর চৈত্র মাসে পূর্ণিমার দিন বনিয়াচক গ্রামে বিবিমার পূজা উপলক্ষে সাধারণের জমির উপর একটি মেলা বসে। "মেলাটি দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবি করা হয়। কালাপাহাড়ের চক, শ্যামপুর, রাধানগর প্রভৃতি গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দুই তিন সহস্র নরনারীর সমাগম হয়" (ঐ, পৃঃ ২০৬)।

দক্ষিণ বারাসাতে "একটি টিনের চালাযুক্ত ইটের ঘরের মধ্যে বিবিমার প্রতীক স্বরূপ পাঁচটি মাটির ঢিপি ও তৎসহ অনেকগুলি বিবিমার শলন মূর্তি আছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি বিবিমার পূজা করেন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বিবিমার পূজা দেন। পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন মাসের প্রতি শনিবার মঙ্গলবার স্ত্রীলোকগণ ভিক্ষালব্ধ চাউল ও অর্থদ্বারা বিবিমার 'মাঙ্গন' পূজা দিয়ে থাকেন" (ঐ, পৃঃ ১৮৬)।

চারটি স্থানের 'বনবিবি' বা 'বিবিমার' পূজার উল্লিখিত বিবরণের মধ্যে কত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই বৈচিত্র্যেই লোকসংস্কৃতি ও তার শাখাগুলির

প্রধান বৈশিষ্ট্য। লোকসংস্কৃতি অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধন করে থাকে, তাতে অতীতের ঐতিহ্যময় সমৃদ্ধির ভগ্নাংশ থাকে, চলতি কালের জীবনযাত্রার ছাপও থাকে। যেমন ছড়া, তেমনি লৌকিক দেবদেবীও। এদের ধারণ শক্তি ও বহন শক্তি প্রবল, তাই তা পুরান হয়েও নতুন, নতুন হয়েও পুরান। ইতিহাসের খন্ড খন্ড চিত্রও এখানে আছে।

সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস উত্থান এবং পতনে বৈচিত্র্যপূর্ণ। শ্রী সতীশ-চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মতে সুন্দরবনের ভাগ্য 'বৌদ্ধযুগের শেষভাগে পড়িয়া গিয়াছিল এবং হিন্দু রাজত্বে পুনরায় জাগিয়াছিল, পরে মোঘলের মধ্য যুগে পড়িয়াছে আর উঠে নাই। মোগল আমলের প্রথমভাগে পাশ্চাত্যের যে সকল জাতি বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসিয়াছিল তাহারা সুন্দরবনকে এমন পতিত, অগম্য হিংস্র সেবিত এবং অরণ্যাবৃত দেখেন নাই; তাঁহারা যাহা দেখিয়াছিলেন এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। এমন আশ্চর্য পতন সুন্দরবন ভিন্ন অন্য কোথাও নাই" (যশোহর-খুলনার ইতিহাস)।

প্রাচীন কালের নিদর্শন হিসাবে সাগর দ্বীপ, হাতিয়াগড়, মনি নদী, রায়দীঘি কঙ্কনদীঘি, জটার দেউল, বিরিঞ্চির মন্দির, ভরতগড়, ভরত রাজার মন্দির, পীর গোরা চাঁদের সমাধি ইত্যাদি এখনও রয়েছে। রয়েছে বহু তন্ত্র-মন্ত্র, বহু লৌকিক দেব-দেবী। এ সবের স্মৃতি সুন্দরবনের মৌলে, বাউলে, মাঝিমাল্লা, কাঠুরিয়া, বনভূমিকে কৃষিভূমিতে রূপান্তরিত করার শ্রমজীবী মানুষেরা বহন করে চলেছেন। এই শ্রমজীবী মানুষেরা সম্প্রদায় নির্বিশেষে বনবিবিকে 'মা জননী'-রূপে ভক্তি করে আসছেন। তাঁরা দক্ষিণ রায়কে ভয় করেন, কিন্তু বনবিবিকে মা রূপে ভক্তি করেন। ভয় ও ভক্তির মধ্যে যে পার্থক্য, সেই পার্থক্যই দক্ষিণ রায় এবং বনবিবির মধ্যে রয়েছে। দক্ষিণ রায় হিংস্র, ভয়ঙ্কর, বনবিবি করুণাময়ী। দক্ষিণ রায় হিংস্র দেবতা, বনবিবি বনের শ্রমজীবী নরনারীর জননী। এই জননীর লৌকিক নাট্যগানই "বনবিবির জহুরানামা।" এ পালা এখনো মঞ্চস্থ হয়।

উত্তরবঙ্গের বনদেবতা

শিবপদ ভৌমিক

উত্তরে হিমালয়ের কোলে যে অরণ্যভূমি সেখানে আজ বহু জনপদ গড়ে উঠেছে। এক কালে তারই পাদদেশে ছিল গৌড় রাজ্য—যা কোন সময়ে বাংলা দেশের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেদিনও উত্তরে আজকের তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল জুড়ে ছিল গভীর অরণ্যভূমি। পশ্চিমবঙ্গের মোট অরণ্যাঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশই রয়েছে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলায়। এই অরণ্য এত গভীর ছিল যে আলোও সেখানে প্রবেশ করতে পারত না। জে. এফ. গ্রুনিং, বুকানন-হ্যামিলটন ও হান্টারের বিবরনীতে দেখা যায়, বৈকুণ্ঠপুর প্রভৃতি অরণ্য সেদিন ছিল দুর্ভেদ্য। আজও উত্তরবঙ্গের অরণ্যাঞ্চলের মধ্যে ৪০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল অগম্য।

যদিও এই সব অরণ্য আজ তেমন গভীর নেই। অরণ্য সম্পদ আজ লুঠেরাদের হাতে পড়ে নিঃশেষিত হতে চলেছে, তবুও এককালে এই অরণ্যকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল উত্তরবঙ্গের সভ্যতা। অরণ্যের মধু, কাঠ, পশু, ভেষজ মানুষের আজও প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এক সময়ে এগুলি সংগ্রহ করাই ছিল মানুষের জীবিকা। তাই অরণ্যের কোলে কোলে সেদিন গড়ে উঠেছিল জনবসতি। আর এই অরণ্যের রহস্যের অভিসারে সেদিনের মানুষের মন যে বার বার দোলায়িত হয়েছে তারই প্রমাণ পাই তাদের বিভিন্ন লোকবিশ্বাসের মধ্যে। বনরাজির গভীর গহনে ডুব দিয়ে মানুষ বার বার আহরণ করতে চেয়েছে অমূল্য মণিরত্ন। তাই তাদের লোকবিশ্বাস, লোকশ্রুতিতে পাই বনদেবতার বিচিত্র সমাবেশ। কখনও রহস্য ভেদে অপারগ হয়ে আবার কখনও বা মুগ্ধবিস্ময়ে হতবাক হয়ে আবার কখনও বা কৌম বিশ্বাসের আনুগত্যে তাঁরা বিচিত্র বনদেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আবার কখনও বা ভয়ে ভক্তি অর্ঘ দিয়েছেন। কালে কালে এর সংগে মিশেছে কিংবদন্তি, লোকাচার, লোককথা ও ছড়ার (বা মন্ত্র তন্ত্রের) সমন্বয়। ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে একাধিক দেবতার প্রভাব ও প্রাধান্য ঘটেছে।

এই সব বনদেবতার মধ্যে বাঘ, হাতি এবং মোষেরই প্রাধান্য বেশী। এছাড়া সাপ, ময়ূর ইত্যাদি পশুপক্ষী ছাড়াও আছে বিভিন্ন বৃক্ষপূজা এবং ব্যাপকভাবে প্রচলিত তিস্তাবুড়ির পূজা। এই ধরনের কিছু বন দেবতার বিবরণ আমরা নিচে দিলাম।

ব্যাঘ্র দেবতা বা ব্যাঘ্রবাহন দেবতা

অরণ্যসম্পদ আহরণকারীদের কাছে বাঘ যেমন আতঙ্কের বস্তু তেমনি তাকে ভয়ে তারা ভক্তি ও পূজা দিয়ে থাকেন। সুন্দরবনের দক্ষিণ রায়ের মতো উত্তরবঙ্গে সোনা রায়ের পূজা হয়ে থাকে। সোনা রায়ের পূজা উত্তরবঙ্গে, আসামের গোয়ালপাড়া, বাংলা দেশের রংপুর, রাজসাহী, পাবনা ইত্যাদি জেলায় এবং বিহারের পূর্ণিয়া জেলায়ও হয়ে থাকে। সোনা রায়ের মূর্তি নেই বলে বলা হলেও কখনও ব্যাঘ্রাসন গামবুট পরিহিত অথবা সন্ন্যাসী রূপী সোনা রায়ের মূর্তি পাওয়া যায়। লৌকিক এই দেবতার পূজায় আজ আর তেমন জাঁকজমক না থাকলেও রাখাল, কৃষক ইত্যাদি গ্রামীণ মানুষের মধ্যে আজও তার প্রচলন রয়েছে।

সাধারণত পৌষ সংক্রান্তিতে বা কোথাও কোথাও শিব চতুর্দশীর রাত্রে সোনা রায়ের পূজা হয়ে থাকে। পূজা উপলক্ষে ভক্তরা দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সোনা রায়ের মাহাত্ম্যকীর্তন করে থাকে। একজন সোনা রায়ের পালাগান সুর করে আবৃত্তি করে আর সঙ্গীরা ধুয়ো ধরে। ভক্তরা দলের সঙ্গে পাটের আঁশ ও সোলার ফুল সজ্জিত একটি বংশদন্ড, একটি চামর এবং একটি ঘটিতে দুধ মিশ্রিত জল নিয়ে বের হয়। ঘটির জল ও ফুল নিয়ে গৃহীকে আশীর্বাদ করে এবং চাঁদা নেয়। গায়করা কখনও সোনা রায়ের পালার খন্ডাংশ গেয়ে থাকেন।

সোনা রায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্ত বলেছেন: ব্যাঘ্র দেবতা পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে এবং উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে প্রথম আবির্ভূত হন। এতদঞ্চলে বাঘের দ্বারা মানুষ ও গৃহপালিত জন্তু লুণ্ঠিত হয় এবং স্বভাবতই সুযোগ সন্ধানীরা প্রচার করতে সক্ষম হয় যে, ব্যাঘ্র নামক দেবতাকে নিবৃত্ত করা যাবে তাকে ভক্ষ্যদ্রব্য উপহার দিয়ে। এর ফলে সকলে বাঘের এই লুটের হাত থেকে রক্ষা পাবে।......কাজেই একথা অস্বীকার করা যায় না যে

সোনা রায় আদিতে লৌকিক দেবতা ছিলেন। পরবর্তীকালে তার সংগে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী যুক্ত হয়েছে।

সোনা রায়ের কোন নির্দিষ্ট মূর্তি নেই বলেই ধারণা। ঢিবির উপরে ফুল দিয়ে আবার কোথাও তীর্যক একটি লাঠির মাথায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে পূজা করা হয়। মালদার গৌড়ে সোনা রায়ের যে পাট বা থান এখনও দেখা যায় প্রতি বছর সেখানে সোনা রায়ের পূজা হয়। মাটির ঢিবির উপর এক খণ্ড পাথরকেই সোনা রায় নামে পূজা করা হয়। রাতুয়া থানার কাগাচিড়া গ্রামে সোনা রায়-এর পাকা মন্দির আছে। মন্দিরে ব্যাঘ্রাসন সোনা রায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। "মালদহ সংগ্রহশালায় রক্ষিত সোনা রায়ের একটি মূর্তি আছে। মূর্তিটিকে সংগ্রহ-শালার কর্তৃপক্ষ দশম শতাব্দীর মূর্তি বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। মূর্তির কোমর পর্যন্ত ভাঙা, উপরের দিকটা নাই। নীচের অংশে দেখিতে পাওয়া যায় একটি সবল ও বৃহৎ বাঘের উপর বসিয়া আছে একটি পুরুষ মূর্তি। পায়ে বুট জুতা। জুতার ডগা নাগরাই জুতার মতো উপরের দিকে তোলা। মালকোচা দিয়া কাপড় পরা। বাহন বাঘটি মুখ ব্যাদান করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই মূর্তিটি আদিনা অঞ্চলের সাতাশঘরা হইতে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। পাথরের এই মূর্তি উত্তর বাংলায় প্রাচীন কালে সোনা রায়ের পূজার বহুল প্রচলনের কথাই ঘোষণা করিতেছে। পাথরের মূর্তি হইতে এ ধারণা করাও অস্বাভাবিক নয় যে সেকালে সোনা রায়ের পূজা শিষ্ট সমাজ এবং রাজা জমিদারদেরও আনুকূল্য লাভ করিয়াছিল।"

[ফনী পাল ঃ সোনা রায়ের পূজা পাঁচালী ও প্রসংগত ঃ পৃঃ ৫]

উত্তরবাংলার বহুস্থানে পূজাকালে সোনা রায়ের মৃন্ময় মূর্তি দেখা যায়।

সোনা রায়কে অনেকে স্বর্ণাধিপতি অর্থাৎ সোনার দেশের অধিপতি বলে অভিহিত করেন।

গোধন ও ধান প্রধান সম্পদ। আর অরণ্যের সম্পদ কাঠ, পশু, মধু, ওষধি, রেশম গুটি ইত্যাদি সম্পদও প্রধান। একটি শ্লোকে আছে ঃ

ধান হইল বড় ধন আর ধন গাই।
কিছু ধন সোনা রূপা আর সব ছাই ॥

[প্রবাদ ঃ সংগ্রহঃ ফনী পাল]

কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যে, সোনা রায়ের ভাই রূপা রায়। মনে করা

হয় কোন পরাক্রমশালী রাজার নাম ছিল সোনা রায় আর তার ভাই রূপা রায়। সোনা রায় রাজা হলেও ব্যাঘ্র দেবতা রূপে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র পূজিত হয়ে থাকেন। ব্যাঘ্রবাহন চতুর্ভুজ মূর্তি কোথাও কোথাও 'মহারাজা' নামে পূজিত হয়। সোনা রায়ের সঙ্গে যেমন শিবের মিল পাওয়া যায় তেমনি মিল পাওয়া যায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের লৌকিক দেবতা মহাকালের সঙ্গেও। আবার চৈতন্য প্রভাবে সোনা রায় কখনও কালো সোনা হয়ে পড়েন। কেউ কেউ আবার বলেন সোনা রায় ধর্মরূপী বুদ্ধের উপাসক ছিলেন। সোনা রায়কে শেষ জীবনে সন্ন্যাসী রূপে দেখা যায়। অর্থাৎ পালা গানের যে অংশে সোনা রায়ের পূজা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে সেই অংশে আকস্মিকভাবে সোনা রায় তার ভাই উপা রায় (রূপা রায়)-কে নিয়ে সন্ন্যাসী রূপে আবির্ভূত হন। সোনা রায়ের এই সন্ন্যাসী রূপ শৈব প্রভাবে না সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রভাবে পালাগায়কদের মুখে রূপান্তরিত হয়েছে তা বলা মুস্কিল।

সোনা রায়ের পূজা বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন সময়ে হয়। সাধারণত বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন বা পৌষ মাসে সোনা রায়ের পূজা হয়। এই মাসগুলি ফসলের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই ব্যাঘ্রদেবতা সোনা রায়কে ফসলের দেবতাও বলা যেতে পারে।

ভান্ডানী

ভান্ডানী, ভান্ডারনী বা ভান্ডালী দেবীকে পৌরাণিক দেবী বলে আজকাল দাবি করা হয়। এই দেবীপূজার উৎপত্তি সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে।

ক. নহুস রাজা শারদীয়া দুর্গাপূজার আয়োজন করে শিকারে যান এবং তাঁর ফিরতে দেরি হওয়ায় রাজবাড়িতে যথারীতি দুর্গাপূজা ও বিজয়াদশমীর বিসর্জন হয়। কিন্তু রাজার পূজা না নিয়ে দেবী স্বর্গে ফিরবেন না বলে ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করে বনমধ্যে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হন। রাজা একাদশীতে বনফুল দিয়ে দেবীর পূজা করেন। এর থেকে ভান্ডানী পূজার প্রচলন হয়।

খ. কোচবিহারের রাজবাড়ির দুর্গাপূজার পর বিজয়াদশমীর তিথিতে দেবী দুর্গা কৈলাশ গমন কালে তাঁর মালপত্রের তত্ত্বাবধানকারিণী ভান্ডারনী পথে

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে দেবীকে আরও তিন দিন মর্ত্যে থাকতে হয়। এবং এই তিন দিন পুনরায় তাঁর পুজো হয়।

গ. দশমীতে দেবী দুর্গার মর্ত্য ত্যাগ কালে তাঁর বোন ভান্ডালী দেবী মর্ত্যে তার পুজো প্রার্থনা করেন। এবং দুর্গা দেবীর নির্দেশে একাদশী তিথি থেকে তিন দিন শারদীয়া দুর্গা পুজোর ন্যায় ভান্ডালী পুজো হয়।

ঘ. ভান্ডালী দেবী চন্ডীরই এক রূপ। চন্ডীমংগল কাব্যের ধনপতির স্ত্রী খুল্লনা দুর্দিনে দেবীর এই মূর্তি স্বপ্নে দেখেন। এবং তাঁর পুজো করেন।

এইভাবে পৌরাণিক কাহিনীর সংগে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা থাকলেও এই সব দেবদেবীর লৌকিক রূপও দেখা যায়। আসলে এই দেবীও সোনা রায়ের মতো লৌকক। ইনি বনদেবী।

ভান্ডানী দেবী দ্বিভূজা এবং ব্যাঘ্রবাহিনী। আবার কোথাও এই দেবীকে সিংহবাহিনীরূপেও দেখা যায়। তাঁর চার হাত। দুর্গাদেবীর অনুকরণে কোথাও লক্ষ্মী-সরস্বতী বা লক্ষ্মী-সরস্বতী ও কার্তিক গণেশের পুজো হয়ে থাকে। অনেকে তাই ভাবেন ভান্ডানী দুর্গাদেবীরই লৌকিক রূপ। সর্বালংকারভূষিতা দেবী বাহনের পিঠে বসার ভঙ্গীতে থাকেন। দক্ষিণ হস্তে বরাভয় অন্য হাতটি কোলের ওপর রাখা। দেবী পশ্চিমমুখিনী। আধুনিককালে চতুর্ভুজা—দুর্গার অনুকরণে ত্রিলোচনা।

ভান্ডানীর পুজো প্রধানত কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার মেখলিগঞ্জ, মাথাভাংগা, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা যায়। এইসব অঞ্চলের কোথাও বিজয়াদশমীর পরবর্তী তিনদিন অথবা লক্ষ্মী পূর্ণিমার সময় ভান্ডানীর পুজো হয় ও মেলা বসে। ভান্ডানীর নির্দিষ্ট পুজককে দেউসি বলে। পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে যতই যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা হোক না কেন ভান্ডানী আসলে লৌকিক দেবী এবং ব্যাঘ্রদেবীও বটেন।

ফালাকাটার মহারাজ

জলপাইগুড়ি জেলার আমবাড়ি-ফালাকাটা রেলস্টেশন থেকে মাইল দেড়েক উত্তরে গেলে দেখা যাবে ফালাকাটার মহারাজের মন্দির। শনের চারচালা ঘরে (এখন টিনের দোচালা) মহারাজার মাটির মূর্তি। মহারাজার দুপাশে দুজন পাইক, মহারাজা বাঘের পাশে দাঁড়িয়ে।

এই মহারাজ ঠাকুরের প্রভাব উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্র। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার কোন না কোন অঞ্চলে মহারাজ ঠাকুরের মন্দির বা থান আজও দেখা যায়। এই মহারাজ কখনও হস্তী, কখনও বা বাঘ বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। লৌকিক এই দেবতা মহারাজ ঠাকুর পরবর্তী কালে পৌরাণিক প্রভাবিত হয়ে মহাদেব, ইন্দ্রর অভিন্নরূপে গণ্য হয়েছেন। কোথাও কোথাও এই দেবপূজায় বৌদ্ধ তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির সঙ্গে অদ্ভুত মিল দেখা যায়। কিন্তু বিভিন্ন দিক বিচার করলে মহারাজ ঠাকুরকে বনদেবতার অভিন্নরূপ বলে মনে হয়। ফালাকাটার মহারাজ সম্পর্কে স্থানীয় প্রচলিত ছড়ায় বলা হয়ঃ

ভক্তি দিমু ফালাকাটা মহারাজ
থাকেন বৈকুন্ঠপুর জঙ্গলৎ।
সারা বছর ঠাকুর থাকেন খালৎ
হোগলার জঙ্গলৎ
পশ্চিমে হইল করতোয়া
উত্তর হইতে পূর্বৎ তিস্তাবুড়ি
বহে ধীর।
এই চৌহদ্দির মাঝৎ বসৎ প্রভুর,
আন্ধারৎ প্রভু করেন আনাগোনা,
দেছেন চমকা হানা মাঝৎ মাঝৎ।
প্রভু না জানেন জাতি বিচার,
মানুষ গরু ছাগল ভেড়া তাই
প্রভুর নিকটৎ তামাম সমান।
... ...
বাপ দোহাই দিনু তোক
গাবুর বয়সে দেখা না পাই তোক।

স্পষ্টতই বোঝা যায় এই বনদেবতা বা ব্যাঘ্রদেবতা স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে বিশেষ ভয় বা শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা পেতেন। গাবুর বয়সে (যৌবন বয়সে) যেন তোর দেখা না পাই—এই কথার মধ্য দিয়ে ভয়ের প্রকাশ পাওয়া যায়। কেবল ফালাকাটায় নয়, এর আশে পাশে শিকারপুরে, রংধামালীতে ও লালটং-এও অনুরূপ মূর্তিপূজা হয়ে থাকে। রংধামালীতে পূজা হয় লক্ষ্মীপূজার দিন,

শ্রাবণ মাসে আমবাড়ি-ফালাকাটার পূজা এবং ভাদ্রমাসে লালটং-এর পূজা হয়ে থাকে। এই এলাকার পাশেই বৈকুণ্ঠপুর অরণ্য অঞ্চল। ভুটান, সিকিম ও নেপালের ব্যাপক পাহাড়ী অঞ্চল বৈকুণ্ঠপুরকে দুর্গপ্রাচীরের মতো ঘিরে রেখেছে। এই বৈকুণ্ঠপুর ও তার সংলগ্ন অরণ্য অঞ্চল এক সময়ে ছিল এখানকার অর্থনীতির প্রধান উৎস। বনের কাঠ ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে দেশ বিদেশে চালানকে কেন্দ্র করে এক সময়ে ফালাকাটায় প্রধান ব্যাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল বলে অনুমান করা যায়। জে. এফ. গ্রুনিং, বুকানন হ্যামিলটন তাদের বিবরণীতে ফালকাটার ঐতিহ্যের উল্লেখ করেছেন। বর্ষায় এখানে করতোয়া নদী দিয়ে হাজারমণী নৌকা আসত। এরই পাশে করতোয়া নদীর তীরে ছিল ভজন-পুরের বন্দর, পচাগড়ের বন্দর, শালডাঙগা, খোড়ামারা, দেবীগঞ্জ প্রভৃতি বন্দর ছিল সেকালে জমজমাট। এই বাণিজ্য কেন্দ্রের প্রধান রপ্তানী ছিল অরণ্যসম্পদ। স্বভাবতই মহারাজা এই অরণ্যের দেবতা হিসাবে জাগ্রত ছিলেন। বনের কাঠ কাটা, মধু সংগ্রহ এবং বিভিন্ন ভেষজ ও বনজ সম্পদ এবং পশু সংগ্রহের জন্য যারা এই অরণ্যে যেতেন তাদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কত লোকসাহিত্য ও লোকাচার। বনসম্পদ আহরণকারীরা উল্লিখিত মহারাজ থানের থেকে প্রথম যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী পূজা দেওয়া সুতার লাছি কিনতেন। এই সুতা যতদূর যাবে বনের ততদূর পর্যন্ত অংশে তারা বনজসম্পদ আহরণ করতে পারতেন। বনের মাঝে যাবার আগে তারা মহারাজের পূজা দিতেন। পূজার আয়োজন সামান্য। দেবতা বলেন, 'যদি অন্ন দিতে না পারো তবে মধু, কলা, কলাই আর ভক্তি দিয়ে ভোগ দেবে।' পায়রা, মুরগী, হাঁস ইত্যাদি বলি দেবার রীতি আছে। মাঠের পাশে আর এক ঠাকুরাণীর ঘর। সেখানে থাকেন তিস্তাবুড়ি। তারও পূজা দেওয়া হয়। কথিত আছে মহারাজ ও তিস্তাবুড়ির মধে এক লড়াইয়ের পর এইরূপ সহাবস্থানের সন্ধি হয়। একবার মহারাজের কাছে এক বুড়ির ছেলেকে বলি দিতে আনলে বুড়ি কাঁদতে থাকেন। তার কান্না শুনে তিস্তা ক্ষেপে যায় এবং সব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তখন তিস্তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মহারাজের পাশেই তিস্তার পূজা হয়ে থাকে। লালটং-এ দেউসিরা (পূজারীরা) পূজার আগে কুন্দদীঘিতে স্নান করে তিনদিন শাক্তমতে আর দুদিন বৈষ্ণব মতে পূজা দিয়ে থাকেন।

ফালাকাটার মহারাজার মূর্তি মাটি দিয়ে গড়া হলেও আগে নাকি কাঠের

মূর্তি ছিল। শিকারপুরে এখনও আশীর্বাদরত মহারাজার কাঠের মূর্তি আছে—যাকে অনেকে ভবানী ঠাকুরের মূর্তি বলে থাকেন। এই মূর্তি তৈরিরও নানা আচার অনুষ্ঠান আছে। ফুঁসা (ফাঁপা নরম) নিম কাঠ দিয়ে মূর্তি তৈরি হয়। 'ফালাকাটা করতোয়া তিস্তা নমো/উত্তরে বিশ্ব কৈলাশ…"ইত্যাদি বলে কাঠের হাতুড়ির ঘা মারা হতো। এবং আগে পূজা দেওয়া হতো। মূর্তি গড়ার জন্য কোন খিলান লাগানো হতো না—খাঁজের মধ্যে আটকে দেওয়া হতো। মাটির মূর্তি গড়ার সময় লোহার দা করতোয়া নদীতে স্নান করিয়ে পূজা দিয়ে তবে তা দিয়ে মূর্তি গড়ার কাজ করা হতো। ভালুকের লোমের তুলি বা পাটের তুলি দিয়ে রং করা হতো আর শজারুর কাঁটা দিয়ে প্রতিমার চোখ আঁকা হতো।

অরণ্যাঞ্চলের এই লৌকিক দেবতাকে নিয়ে পরবর্তীকালে বিভিন্ন গান ও কাহিনী রচিত হয়। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যেমন অনেক সময় তাকে মহাদেব বা শিব থেকে পৃথক করা যায় না, তেমনি কোন কোন রাজা মহারাজার সঙ্গেও তাকে অভিন্ন করে ফেলা হয়েছে। একটা কাহিনীতে বলা হয়েছে: কৈবর্ত বিদ্রোহের সময় বন্দী রামপাল জনৈক রাজকর্মচারী বা মন্ত্রীর সহায়তায় গর্ভগৃহ বা বন্দীশালা থেকে সাদা ঘোড়ায় চড়ে করতোয়া নদী পার হয়ে পালাচ্ছিলেন তখন ক্লান্ত হয়ে রাত্রে এক গাছের নিচে আশ্রয় নেন। সেই সময় বাঘে তাঁর ঘোড়া খেয়ে যায়। তখন তিনি বাঘের পূজা করতে থাকেন। তাঁর ভাই উজ্জয়িনী থেকে দাদাকে খুঁজতে এসে একই অবস্থায় পড়েন। তখন তিনি পূজারত দাদাকে পাহারা দেন। এই মহারাজই পরে মহারাজ ঠাকুর নামে পূজা পেয়ে আসছেন। গল্প চলতে চলতে আধুনিক কালে তাকে ভবানী পাঠকের সঙ্গেও অভিন্ন করে তোলা হচ্ছে। তেমনি নানা রকম অলৌকিক কাহিনীও জড়িয়ে পড়েছে এর সংগে। মন্দিরের সামনের দুটো গাছকে লোকেরা বিশেষ করে রাজবংশীরা আগে পূজা দেন। পরে ঠাকুরের পূজা দেওয়া হতো। কারণ হিসাবে বলা হতো এই গাছদুটি ঠাকুরের প্রহরী। কাহিনী প্রচলিত আছে: একবার এক চোর ঠাকুরের গয়না নিয়ে পালাচ্ছিল তখন এই গাছদুটো তাকে চেপে ধরে। একবার এক মহিলা পূজার থালা নিয়ে যাচ্ছিল তখন তাকেও গাছদুটি ধরে ফেলে। বলিদানের রক্ত এই গাছের ফাঁকে রেখে দেওয়া হয়। আর রাত্রে বাঘ এসে দুই গাছের ফাঁকে দাঁড়িয়ে সেই রক্ত পান করত। এই সব গল্পের

সত্যতা থাক বা না থাক কিন্তু মোটিফ (motif) দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় ইনি বনদেবতা বা ব্যঘ্রদেবতা না হয়ে যান না।

মহাকাল বাবা বা হাতি

হিমালয়ের কোলে পূর্বে গারো পাহাড় থেকে পশ্চিমে পূর্ণিয়া জেলা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ 'অঞ্চল জুড়ে ছিল হাতির বিচরণ ভূমি। হাতি সাধারণত ৬০০০ ফুটের ওপরে যায় না। প্রতি বৎসর বর্ষার শেষে প্রচুর হাতি তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের নিম্নভূমিতে অবাধ বিচরণের জন্য দলে দলে নেমে আসে এবং শীতের শেষে পাহাড়ে উঠে যায়। কোন কোন সময় এক একটি দলে দেড়শত থেকে দুইশত হাতিও থাকে। এক কথায় তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে হাতি মানুষের নিত্য সংগী। প্রতি বৎসর বর্ষার শুরু থেকেই তাঁরা হাতি পূজা শুরু করেন আর শুরু করেন হাতি বান্ধার আয়োজন। এরা গণেশকে হাতির দেবতারূপে চিহ্নিত করেন—যার জন্য গণেশ পূজাও করেন। এ সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলে গল্প প্রচলিত আছে ঃ গণেশের জন্মের পর শিব বললেন দুর্গাকে, 'তোমার ভাই শনিই আগে দেখবেন গণেশকে'। কিন্তু শনিকে খবর দিলে তিনি ভাগনাকে দেখতে আসেন না। তিনি বলেন, আমি যদি দেখি তবে তোমার ছেলের মাথা উড়ে যাবে। দুর্গা মনের দুঃখে বলেন ঃ

বোনের ঘরে ভাগনা হইল্
মামা দেখিবে আগত।
কেমনে থাকিমু মুই পরের ঘরত
দ্বিগুণ জ্বালায় বিধি হইল মোর বাম ।।

শেষ পর্যন্ত দুর্গার পীড়াপীড়িতে শনি গণেশকে দেখতে এলেন, কিন্তু তিনি ছয় মাস দূরের স্থান থেকে ভাগনাকে দেখলেন। তাতেই ভাগনার মাথা উড়ে গেল। তখন শনি বললেন, উত্তরে যাও, যার মাথা পাবে তার মাথা কেটে এনে লাগিয়ে দাও। তাতে অন্তত গণেশ বাঁচবে। উত্তর দিকে শিবের চেলারা গিয়ে প্রথমেই পেল হাতির দেখা। হাতির মাথা কেটেই লাগানো হলো গণেশের গলায়। গণেশ বাঁচলো কিন্তু হস্তিমুখো হয়ে। দুর্গা আফসোস করে বললেন,

হস্তিমুখো ছোয়া মোর
কেমনে উঠাম মুই কোলত।
দ্বিগুণ জ্বালা বিধি হইল্ মোর বাম।

উত্তরবঙ্গের লোকজীবনের পর্বে পর্বে হাতির কাহিনী জড়িয়ে আছে। আছে গান, ছড়া, গল্প ও পূজানুষ্ঠান। হাতিচরিত উত্তরবঙ্গের লোকেদের যেন নখদর্পণে। যে বছর কলাগাছ বেশী হয়, কাশ ফুলে ভরে যায় নদীর চর, সে বছর হাতি আসে বেশী। সন্ধ্যায় হরিণ ডাকলে হাতির আসার বার্তা পায় তারা। সাঁওতালরা বলেন, যখন 'সাঝমে কুত্তা ভুগতে, রাত বারা বাজি কুত্তা ভুগতে' তখন হাতি আসবার খবর এলো। নেপালীদের বিশ্বাস যেবার গোয়ালঘরে 'গাইরু 'করঅছ' সেবার হাতি আসবেই। এই হাতি আসবার খবর এ'ল চলে পূজানুষ্ঠান। তেল, সিঁদুর, ভাইদাল ও একগোছা ধানের শিস্ দিয়ে তারা পূজা করে হাতিদেবতা গণেশের। কেউবা সিরকেল বেজস, একগোছা ধানের শিস্, কলা, ধূপ, সিঁদুর আর মেটে হাঁড়ির মধ্যে জল রেখে মহাকাল বা গণেশের উদ্দেশে পূজা দেয়। ডুয়ার্সের রাস্তাগুলিতে মাঝে মাঝেই মহাকালের বাস দেখা যায়। লাটাগুড়ি ফরেস্টের কাছে এমনি একটা থানে গাড়ি চালকরা গাড়ি থামিয়ে পূজার পয়সা ফুল বা অন্যান্য জিনিস দিয়ে যায়। হাতি ধরতে যাওয়ার সময় বা হাতিকে পোষ মানাবার সময়ও মহাকালের উদ্দেশে পূজা দেওয়া হয়।

মৈষাল

পশুপালক যুগ থেকে উত্তরবঙ্গে মোষ পালন ও মোষচারণ একটা প্রধান জীবিকা হয়ে আছে। এই মোষপালক রাখালরা কখনও আপন সুখদুঃখের গান গেয়েছেন আবার কখনও বা তাদের উদ্দেশে রচিত হয়েছে বিরহার্তির গান। এই মৈষাল যেন কৃষ্ণের প্রতিমূর্তি হয়ে ভাওয়াইয়া সুরের অপূর্ব ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছেন।

গলার কাঠি সনা মৈষাল রে—
মৈষাল কুন্ বা দ্যাশে যাও
কার মুখ দেখিয়া মৈষাল
জুড়াম সনার গাও, মৈষাল রে।

এই মোষই মৈষালের (মোষ চালকের) ধন সম্পদ। এমন কি বনের বাঘের মুখ থেকে মোষই তাকে বাঁচায়। একটি গান আছে ঃ

ধেনু ভইষের তেমনি সুখ
কাড়িয়া কাড়িয়াই ছেকেন দুধ রে।
আরে ও বাগর ভইষের দফাদার
ভইষ গেইল তোর চিলমারির বাথানে।

মোষ বা মৈষালকে নিয়ে যদিও কোন আনুষ্ঠানিক পূজা, মূর্তি বা থানের প্রচলন নেই তবুও মোষ এবং মোষের বাথান উত্তরবঙ্গের অরণ্যের কোলে থাকা রাখালিয়া মানুষের বিশেষ আদরের জিনিস ছিল। 'মৈষালবন্ধু' পালাগান বিশেষ জনপ্রিয়ও ছিল সর্বত্র।

এছাড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু কিছু দেবতার জনপ্রিয়তা রয়েছে—যারা কোন না কোন পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করে চলেছেন। এর মধ্যে শিব এবং দুর্গার প্রাধান্য সর্বাধিক। শিব কখনও কৃষিদেবতা কখনও বনদেবতা আবার কখনও বা দেবাদিদেব। দুর্গা লক্ষ্মীরূপে কৃষি-দেবতা আবার কখনও বা বন্য পশুর হাত থেকে ফসল বাঁচানোর জন্য বনদেবতা।

জলপাইগুড়ি জেলায় রাভা সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা ব্যাঘ্রবাহিনী দেবী কামাখ্যা। ইনি দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন। আবার ঋষি বা মহাকাল প্রকৃত অর্থে শিবেরই রূপান্তর। মেচ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত মহাকাল এক ধারে কৃষি ও শিকারের দেবতা। মহাকালের অন্য নাম বাথো। বাথোর স্ত্রী মেইনো। তিনি কখনও লক্ষ্মী আবার কখনও দুর্গারূপে পরিচিতা। টোটোদের মধ্যেও মহাকাল দেবতার প্রচলন যিনি ওদের ভাষায় ইসফা বা সামুজা নামে পরিচিত। দার্জিলিং-এ লেপচা জনগোষ্ঠীর জনপ্রিয় দেবতা 'চু-মুঙ' বা তুষার মানব, শের্পা ও তিব্বতীদের মধ্যে যে তুষার মানব বা ইয়েতির কথা প্রচলিত আছে 'চু-মুঙ'-কে সেইরূপ দেবতা হিসাবে কল্পনা করা হয়। চু-মুঙ-কে শিকারের দেবতা বা বন্য পশুপালক বলে স্বীকার করা হয়। লেপচারা শিকারে যাবার আগে চু-মুঙ-কে পূজা দেন। বিপদসংকুল দুর্গম ঘন বরফাবৃত অন্ধকার গুহাতে চু-মুঙ বাস করেন। অনেক লেপচা শিকারী এই তুষার মানব বা ইয়েতির দেখা পেয়েছেন বলে দাবি করেন। তারা 'শেরাবু লকু' নামে নাচের মধ্য দিয়ে এই দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জানায় এবং

শিকারের অংশবিশেষ দেবতাকে উৎসর্গ করে। কোম বিশ্বাসে কোন কোন জনগোষ্ঠী যে পশুর ওপর প্রধানভাবে নির্ভরশীল তাদের দেবতা বলে মানে। যেমন আফ্রিকার পিগমীরা হাতির মাংস খায়। আবার সেই হাতির উদ্দেশে গান করে ঃ

হে পিতা। আমরা তোমার সন্তান।
আমাদের প্রতি রাগ করো না।
আমরা তোমাকে হত্যা করছি।
আবার আমাদের মধ্যে দিয়েই
তোমাকে বাঁচিয়ে তুলছি।
রাগ করো না, তোমার উন্নত জীবন হচ্ছে।

এই ভাবেই জন্ম নিয়েছে বহু কৌলবিশ্বাস। আর এই কৌলবিশ্বাসই উত্তরণ ঘটেছে বহু লোকদেবতায়। এই সব বনদেবতা এই লৌকিক দেবদেবীরই প্রতিনিধি—যারা সুদীর্ঘকাল ধরে লোকজীবনের সুখ দুঃখের সাথী হয়ে আছে।

বনদেবতা সম্পর্কে আদিবাসী সমাজের ধ্যান-ধারণা

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে

পাহাড় পর্বতে ঘেরা অরণ্য জনপদে আদিবাসীরা বাস করে এবং তারা প্রকৃতি-পূজারী। প্রকৃতির প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর অন্তরালে যে এক অদৃশ্য শক্তি ক্রিয়াশীল, তা তারা বিশ্বাস করে। চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র, নদ-নদী পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল এক কথায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু তাদের ধারণায় কোন না কোন দেব-দেবী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, তাই প্রকৃতি সজীব ও প্রাণবন্ত। আবহমান কাল ধরে আদিবাসী সমাজ এই সব দেবদেবীর উদ্দেশেই পূজা-অর্চনার মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসছে। জেমস্ ফ্রেজার লিখেছেন ঃ

'The worship of Nature is based on the assumption that natural phenomena whether animate or inanimate are living personal beings analogous to man in their nature though often for superior to him in power. In short, the worship of Nature is based on the personification of Nature."[1]

বলতে বাধা নেই, প্রকৃতিপূজাই সমস্ত আদিবাসী সমাজকে এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ করে রেখেছে। এমন কি আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের আদিম সমাজেও একই বিশ্বাস বদ্ধমূল তা নিচের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট জানা যায় ঃ

The Bantu of Africa think that spirit dwell in springs rivers and lakes, in rocks and piles of stones, in trees caves and hills.

The Arunta of Australia have a firm belief in the existence of spirits, which are thought to live in trees and rocks, to prowl about especially at night to travel long distances rapidly and easily and to be capable of cruel and beneficent deeds."[2]

আদিবাসী সমাজের এই ধর্মীয় বিশ্বাস আজও অটুট রয়েছে। আদিম বিশ্বাসকে তারা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি। কারণ, জীবন-

সংগ্রামে টিকে থাকতে গিয়ে তারা দেখেছে যে, প্রকৃতির অন্তরালের এই অদৃশ্য শক্তির কাছে তারা বড় অসহায়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মড়ক-মহামারীতে মৃত্যুভয় তো আছেই ; এ ছাড়াও বনে জঙ্গলে বসবাস কিংবা চলাফেরা করতে গিয়ে সব সময়ই বিপদের আশংকা। এ সব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা প্রকৃতির প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর অন্তরালে যে অলৌকিক শক্তি ক্রীয়াশীল তাঁকে দেবদেবী জ্ঞানে পূজা করে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আদিবাসীরা বনে-জঙ্গলে বাস করে। তাই, তাদের কল্পিত বিভিন্ন দেব-দেবীর মধ্যে বনদেবতা ও বনদেবীর প্রাধান্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে বলে রাখি, আদিবাসী সমাজে দেবদেবীর কোন মূর্তি নেই। সাকার মূর্তিকল্পনা তাদের সমাজে এখনও অনুপ্রবেশ করেনি। নিরাকার মূর্তিতেই দেবদেবী পূজা পান। পূজার থানে বিভিন্ন দেবদেবীর নামে ঘর কেটে নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। আবার কোন কোন আদিবাসী গোষ্ঠী দেবতার থানে পোড়ামাটির হাতি ঘোড়াও উৎসর্গ করে। যাই হোক, বনদেবতা ও বন-দেবী সম্পর্কে আদিবাসীদের চিন্তা-ভাবনা কি ? কি ভাবেই বা তারা বনদেবতা অথবা বনদেবীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ?

প্রথমে লোধাগোষ্ঠীর কথাই ধরা যাক। বড়াম দেবতাকে তারা বনদেবতা হিসাবে মানে ; বনে-জঙ্গলে ফল-মূল খাদ্য সংগ্রহ করতে যাবার আগে তারা বড়াম দেবতাকে স্মরণ করে থাকে। তাদের বিশ্বাস, বড়াম শক্তিশালী বনদেবতা এবং তিনি বনের হিংস্র জীবজন্তুদের হাত থেকে তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য বাঘের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়ান।

জঙ্গলে কোন এক পুরোনো গাছের নিচে বড়াম দেবতার থান থাকে। লোধা-দের ধারণা, বড়াম দেবতা মানুষের মত লম্বা, সারা দেহ লোমে আবৃত, চোখ বড় বড় এবং তার হাতে থাকে কুড়াল। তাঁকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য পৌষ সংক্রান্তি এবং চৈত্র সংক্রান্তির দিনে মাটির ঘোড়া বা হাতি উৎসর্গ করা হয়। পূজার দিনে লোধারা সবাই একসঙ্গে বড়াম দেবতার থানে যায়। সেখানে পূজারী বড়াম ঠাকুরের থানটি গোবর দিয়ে নিকিয়ে পরিষ্কার করেন। তারপর সেখানের মাটিতে এবং ঠাকুর থানে সিঁদুরের ফোঁটা দেন। অনেক সময় পাথরে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে বড়াম ঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপন করেন। পরে হাত ধুয়ে সিঁদুরের দাগের ওপর তুলসী পাতা রাখেন এবং তুলসী পাতার উপর জঙ্গলের ফল-মূল

দিয়ে তৈরি প্রসাদ ভক্তিভরে বড়াম ঠাকুরকে নিবেদন করে প্রার্থনা জানান, হে ঠাকুর, এ বছর যেন কোন জীবজন্তু আমাদের আক্রমণ না করে। যদি আমাদের রক্ষা কর, তবে আগামী বছর এমনিভাবে আবার তোমার সেবা করব।

এ ভাবে তারা বনদেবতা বড়াম ঠাকুরের আশীর্বাদ কামনা করে। লোধাদের বিশ্বাস, বড়াম ঠাকুরের পুজো না করে জঙ্গলে গেলে যে কোনো সময়ই বিপদের সম্ভাবনা।

লোধারা শুধু বনদেবতার পুজো করে না, বনদেবীরও পুজো করে। চন্ডী তাদের বনদেবী এবং নানা নামে পরিচিত। যেমন—জয়চন্ডী, বড়ামচন্ডী, ভৈরবীচন্ডী ইত্যাদি। চন্ডীর তিন চোখ এবং রাত্রে চোখ জ্বল জ্বল করে; বন্যজন্তু ও বিষধর সাপের হাত থেকে তিনি তাঁর ভক্তদের রক্ষা করেন। সাধারণত গাছতলায় তাঁর অধিষ্ঠান। সেজন্য মাটির ঘোড়া তাঁর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। বছরে তিন-চার বার চন্ডীর পুজো হয়। পুজোর সময় ফল-মূল, কাপড়, সিঁদুর তেল মিষ্টি চন্ডীকে তুষ্ট করার জন্য উপহার দেওয়া হয় এবং ছাগল, মুরগি উৎসর্গ করা হয়।

'গিরিং' হলেন খাড়িয়াদের বনদেবতা। তিনি সব রকম বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন, তাই বনে-জঙ্গলে ফল-মূল সংগ্রহ করতে যাবার আগে খাড়িয়ারা গিরিং দেবতাকে স্মরণ করে থাকে। গ্রীষ্মকালে গিরিং দেবতার উদ্দেশে একটি মুরগি উৎসর্গ করা হয় এবং একমাত্র অবিবাহিত ছেলেরাই সে মুরগির মাংস খেতে পারে। পুজোর সময়ে আতপ চাল, সিঁদুর, ধূপ, ধুনা, দুধ তুলসী পাতা প্রভৃতি লাগে।

বিরহড়দের বনদেবতা হলেন 'চন্ডী'। অনেকে চন্ডীকে 'সেন্দরা বোঙ্গা' (শিকারের দেবতা) বলে থাকেন। শিকারের সময়ে জঙ্গলে চন্ডীর পুজো করা হয়। চন্ডীর বিনা অনুমতিতে বনে-জঙ্গলে পশু হত্যা পাপ। সেজন্য শিকারের পূর্বে 'নায়া (পুরোহিত) চন্ডীর পুজো করে থাকেন। চন্ডীর পুজো না করে জঙ্গলে শিকার করতে গেলে অমঙ্গল ঘটে বলে তাদের বিশ্বাস।

ওরাওঁদেরও বনদেবতা হলেন চন্ডী। শিকারের আগে চন্ডীকে মানত করতে হয়। পুজোর দিনে ওরাওঁ পুজারী খুব ভোরে নদী কিংবা পুকুরের জল কেউ ব্যবহার করার আগেই সেই জলে স্নান করে নেন। স্নান হলে কেউ একজন তাকে কাঁধে তুলে চন্ডীর থানে নিয়ে যায়। চন্ডীর থান গোবর দিয়ে

নিকিয়ে পরিষ্কার করা হয়, সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয় এবং একটি লাল মোরগ উৎসর্গ করা হয়। চন্ডীর পূজো না হলে ওরাওঁরা শিকারে যায় না। সাধারণত ফাল্গুন মাসেই চন্ডীর পূজো হয়।

ভূমিজরা কার্তিক মাসের অমাবস্যার দিনে 'বাঘুত 'দেবতার পূজো করে। বাঘুত তাদের বনদেবতা। জংগলের জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাঘুত দেবতাকেই তারা সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে। বাঘুত দেবতার উদ্দেশে ছাগল ও মুরগি উৎসর্গ করা হয়।

কোড়াদের বনদেবতা হলেন 'বাগেশ্বর'। বনে জংগলে ফল-মূল খাদ্য সংগ্রহ করতে যাবার আগে তারা বাগেশ্বর দেবতাকে স্মরণ করে। প্রতি বছর কোড়া পূজারী 'মাহাতো' এই বনদেবতার উদ্দেশে পায়রা, মুরগি কিংবা পাঁঠা বলি দিয়ে থাকেন। কোড়াদের বিশ্বাস, বাগেশ্বরের পূজো দিলে বনে জংগলে অমংগলের ভয় থাকে না।

পাহাড়িয়ারা 'আউংগা'র পূজো করে থাকে। 'আউংগা' জংগল এবং শিকারের দেবতা। তবে, তারা অন্যান্য আদিবাসীদের মত শিকারে যাবার আগে দেবতার পূজো করে না। শিকারের পরে দেবতার পূজো করে।

হো'রা 'বাগিয়া বোংগাকে' বনদেবতা হিসেবে পূজো করে। তাদের বিশ্বাস, বাগিয়া বোংগাই বন্য জীবজন্তুদের বশে রাখেন। কিন্তু শিকারে গেলে তারা বাগিয়া বোংগাকে স্মরণ করার সময় শিকারের দেবতা 'সাংগা বোংগার' পূজো করে। সাংগা বোংগার পূজো করলে যেমন অমংগলের ভয় থাকে না তেমনি ভাল শিকার পাওয়া যায় বলে তারা মনে করে।

সাঁওতালদের ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়। বনদেবতা হলেন 'বির বোংগা', কিন্তু শিকারে গেলে তারা 'রংগো রুজি বোংগা'কে স্মরণ করে। কোন এক কেঁদু গাছের নিচে রংগো রুজি বোংগার থান থাকে। শিকার জংগলের আহ্বায়ক 'দিহরি' সেখানে রংগো রুজি বোংগার উদ্দেশে মুরগি উৎসর্গ করেন। শিকারীরা অশ্লীল গান ও উলংগ হয়ে নাচ করে দেবতাকে তুষ্ট করে।

আদিবাসী সমাজ এক সময়ে শিকারজীবী সমাজ ছিল। শিকার ও ফল-মূল সংগ্রহের জন্য তাদের বনে জংগলে প্রবেশ করতে হত। বনে-জংগলে চলাফেবায় মৃত্যুভয় সব সময়ই তাদের বিব্রত করে তুলত। ফলে, বনজংগলের অন্তরালে যে দেবতা ও অপদেবতাদের প্রভাব রয়েছে তা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়। এ থেকে

রেহাই পাওয়ার জন্যই তারা বনদেবতাকে তাদের ধর্ম ও বিশ্বাসে স্থান দিয়েছে।

বনদেবতার পূজা খুব কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের পুরোহিত সাধারণত বনদেবতার পূজা করেন না, নারীরাও এ পূজাতে অংশগ্রহণ করে না। বিশেষভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিই একমাত্র বনদেবতার পূজা করেন; কারণ এ পূজা যদি ভালভাবে ঠিকমত করা না হয়, তাহলে অমঙ্গল ঘটতে পারে। পুরোহিত পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপবাসী থাকেন। পূজার সময়ে তিনি নিজের কয়েক ফোঁটা রক্তও আতপ চালে ভিজিয়ে দেবতাকে উৎসর্গ করেন।

বনদেবতার অস্তিত্ব আদিবাসী সমাজের ধর্ম বিশ্বাসে গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই বিশ্বাসই তাদের জীবন তথা সংস্কৃতি।

---

1. J. G. Frazer : The worship of nature. Vol. I. P. 19
2. J. Finegan : The Archaeology of world religions. P-14